মুক্তি-সংগ্রামে বাঙালী সৈনিক

প্রথম খণ্ড

(সিঙ্গাপুরের পতন হইতে ইম্ফলের যুদ্ধ পর্যন্ত)

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের 'সনদে বাহাদুরী' উপাধিধারী
বাহাদুর গ্রুপের অফিসার
শ্রীনিতাইলাল বসু
প্রণীত
ও
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বুক করপোরেশন লিমিটেড
১১, গোপাল বসু লেন,
কলিকাতা

বুক করপোরেশনের পক্ষ হইতে
শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ ঘোষ
১১, গোপাল বসু লেন, কলিকাতা।

মূল্য—৩৲ টাকা

ঢাকা এজেণ্টস :—
আসাম বেঙ্গল লাইব্রেরী
ও
স্কুল সাপ্লাই কোং

প্রিণ্টার—শ্রীরামকৃষ্ণ পান
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা



নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

পরিচয়

এই বইখানির নামকরণে যদিও "মুক্তি-সংগ্রামে বাঙালী সৈনিক", এই শিরোনামাটি প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে "আজাদ হিন্দ্ বাহিনী"র অন্তর্ভুক্ত এক বাঙালী সৈনিকের সাংগ্রামিক জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি নানাকথা ও কাহিনী চিত্তাকর্ষক গল্পের ভঙ্গিমায় পরিবেশন করা গিয়েছে, কিন্তু আসলে এর বিরাট পটভূমিকা ও ব্যাপক পরিবেশের প্রতি অংশটি ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা যুগপ্রবর্তক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনন্যসাধারণ ঐন্দ্রজালিক কার্য-কলাপের অবদানে অনুরঞ্জিত।

আজ আর একথা গুপ্ত নাই--১৯৪০ অব্দে নেতাজী যখন গান্ধীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকালে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, তখন তার উত্তরে তাঁর শুদ্ধ কণ্ঠ থেকে এই বাণীই নির্গত হয়েছিলো—"If you succeed, I shall be the first man to congratulate you," অর্থাৎ "তোমার উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ করলে আমিই সর্বাগ্রে তোমাকে অভিনন্দিত ক'র্বো।" এই জন্যেই একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে এই ভারতবর্ষেই সেবাগ্রামের শুদ্ধাশ্রমেই সর্বপ্রথম মুক্তি-সংগ্রাম কারী আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। এই জন্যেই নেতাজী সম্পর্কে মহাত্মাজী একদিন গদ গদ স্বরে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—"The hypnotism of the I. N. A. has cast its spell upon us. Netaji's name is one to conjure with", অর্থাৎ—"আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম ইন্দ্রজালের মত আমাদের অন্তরকে অভিভূত করেছে—নেতাজীর নাম হয়েছে যেন যাদুমন্ত্র।" নাগপুরের ভোঁসলাবংশের

রাজা রঘুজীও সেদিন নেতাজীর আলেখ্যকে উদ্দেশ্য করে শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন—"নেতাজী, মহান শিবাজীর পর এক মাত্র আপনিই ভারতে প্রকৃত স্বরাজপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন—আপনিই দেশের শাসক হবার যোগ্যব্যক্তি! বাস্তবিকই নেতাজীর নাম আজ আসমুদ্রহিমাচল জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর যেন জপমন্ত্র হয়ে উঠেছে, আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর বীর সৈনিকদের কাহিনী আজ সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, 'জয় হিন্দ' ধ্বনি আজ যেন নির্বীর্য জাতির দেহে, মনে শক্তি ও সাহসের এক অদ্ভুত প্রেরণা দিয়েছে। যে তীব্র দেশপ্রেম, বিপুল ত্যাগ, দুর্বার শক্তি, অসীম সাহস ও অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য নেতাজী ভারতবাসীর নিকট সার্থক সৃষ্টি পুরাণ-ইতিহাসের চিরস্মরণীয় বীরবৃন্দের মত বরেণ্য হয়েছেন—তাঁরই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর যে অক্লান্ত উদ্যম, বিপুল পরাক্রম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগ ভারতের মানুষ মাত্রেরই অন্তরে বিস্ময়ের শিহরণ তুলেছে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিরদিন তা জাতির নমস্য হয়ে থাকবে। সেই সঙ্গে নেতাজীর পরিচালিত এই বাহিনীর বিশদ কাহিনী জানবার প্রয়োজনও আজ দেশবাসী অবশ্যই উপলব্ধি করবেন।

বর্তমানের শোচনীয় সাম্প্রদায়িক সংকটকালে সাম্প্রদায়িকতাহীন এই আজাদ বাহিনীর জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গেও দেশবাসীর আজ নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার প্রয়োজন আছে মনে করি। নেতাজী এমন এক অকাট্য মিলনগ্রন্থীতে লক্ষ লক্ষ আজাদী সৈনিককে বেঁধেছিলেন যে, তাদের মধ্যে জাতি বা ধর্মগত সমস্যা বলে কিছু ছিল না। আজাদী সৈনিকরা কোন দিন ভাববারও সুযোগ পেতেন না যে—তাঁরা হিন্দু, মুসলমান কিংবা শিখ। দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ

হিন্দ বাহিনীকে যখন আবদ্ধ করে রাখা হয়, সে সময় সমর-বিভাগের সেক্রেটারী কর্ণেল মহবুবকে সৈন্যদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করায় মিঃ মহবুব হেসে উত্তর দেন—"আমরা কোন দিন এভাবে আমাদের সৈন্যদের হিসাব করিনি; আমরা প্রত্যেকে ভারতীয় এবং আমরা ভারতের মুক্তির জন্যই যুদ্ধ করছি—এই হচ্ছে আজাদ বাহিনীর পরিচয়।"

১৯৪১ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই এত দ্রুতগতিতে তাহার অধিকারের পরিধি বিস্তার করতে থাকে যে, সমগ্র পৃথিবীর বুকে রীতিমত একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। ১০ই ডিসেম্বর জাপান বিখ্যাত বৃটিশ রণতরী 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌' ও 'রিপাল্‌স্‌' ধ্বংস করে দু'সপ্তাহ মধ্যেই প্রাচ্যের প্রধান বৃটিশ ঘাঁটি হংকংয়ের উপর জয়পতাকা উড়িয়ে দেয়। ২রা জানুয়ারী ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা আমেরিকার হাত থেকে কেড়ে নেয়, তারপর মাস দেড়েকের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪২ অব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অজেয় বৃটিশ নৌ ঘাঁটি সিংগাপুর জাপানীদের করায়ত্ত হয়। এর পর চলে ব্রহ্মের পথে জাপানের বিজয় অভিযান। তার ফলে, ১০ই মার্চ মিত্রসেনা রেঙ্গুন ত্যাগ করে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। এই সময় ব্রহ্মদেশ, মালয় ও সিংগাপুরে প্রায় বিশ লক্ষ ভারতবাসী বসবাস করতেন। পশ্চাদপসরণকারী মিত্রশক্তি তখন নিজেদের সামলাতেই ব্যস্ত, এই সব ভারতীয়ের কি অবস্থা হবে—তাঁদের ধনপ্রাণ রক্ষার কি উপায় করা যায়, সে সম্বন্ধে ভাববার ফুরসৎও তাঁরা পান নি বা প্রয়োজন বোধ করেন নি। সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই সকল অঞ্চলে যে সকল ভারতীয় বাহিনী এবং বাহিনী-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মীবৃন্দ এতদিন মিত্রশক্তির প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা রক্ষাকল্পে শেষ পর্যন্ত

লড়েছেন বা সামরিক কর্তব্য পালন করেছেন, চরম সংকটকালে মিত্র বাহিনীর সুবিধাবাদী নায়কগণ তাদের সম্বন্ধেও চিন্তা করবার অবসর পর্যন্ত পান নি—গুরুভার বোঝা ভেবেই সহস্র সহস্র সামরিক ভারতীয়কে অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর সমর্পণ করে নিজেদের পলায়নের সুব্যবস্থা করেছিলেন। এই সম্পর্কে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, বৃটিশ রণনায়কদের এই দুর্বলতা, ভ্রান্তি ও স্বার্থপরতা সিংগাপুরের ৬০ হাজার সৈনিককেই শুধু বিক্ষুব্ধ করে নি—প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের কুড়ি লক্ষ বে-সামরিক ভারতবাসীর চোখের সামনে বৃটিশ প্রকৃতির এই দুর্বল দিকটা উদঘাটিত করে দেয় এবং এরই ফলে ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবার উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর গঠন সম্ভব হয়ে ওঠে।

সকলেই জানেন, ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নেতা জাপান প্রবাসী স্বনামধন্য রাসবিহারী বসু বহুদিন থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। তিনিও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রাচ্য রণস্থলের অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বুঝলেন, তাঁর দীর্ঘকালের স্বপ্নকে বাস্তব করবার দিন এবার এসেছে। ছুটে এলেন তিনি সিংগাপুরে, পরাধীনতার বেদনা বহুদিন ধরে তিল তিল করে উপলব্ধি করেছেন তিনি—মুক্তিসংগ্রামের আলোক-রশ্মি সর্বপ্রথম ভারতীয় কংগ্রেস থেকেই বিচ্ছুরিত হয়েছিল জেনেই সর্বপ্রথমে যুক্তি দিলেন—সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন এবং বিদেশী-প্রভাব-বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করবেন ভারতীয় কংগ্রেস। রাসবিহারী বসুর এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯৪২ অব্দের জুন মাসে শ্যামের রাজধানী ব্যাংকক শহরে এক সম্মেলন

বসলো। জাপান, হংকং, চীন, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, সিংগাপুর, বর্মা, শ্যাম, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনে বসু মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল, উপরন্তু সাব্যস্ত হল যে, সম্মেলন ভারতবর্ষকে এক ও অখণ্ড গণ্য করে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাবেন এবং একতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ হবে আন্দোলনকারীদের মূলমন্ত্র। সম্মেলনের সমস্ত কাজ জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিণত হবে—সম্প্রদায় বা ধর্মের ভিত্তিতে নয়। ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র রচনা করবেন। স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার জন্য আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ (Indian Independence League) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে, আর এই প্রতিষ্ঠানই অবিলম্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের (Indian National Army) গঠন করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ভার ভারতীয়দের হাতেই থাকবে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রত্যেক সভ্যই **আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের** সভ্য হবেন এবং সঙ্ঘের কাছে আনুগত্য স্বীকার করবেন। সঙ্ঘের কর্ম-পরিষদ যতটা ও যে-ধরণের বৈদেশিক সাহায্য লওয়া সমীচীন মনে করবেন, সেইরূপ সাহায্যই শুধু নেওয়া হবে। যে সমস্ত ভারতীয় বর্তমানে ভারতে বা অন্য স্থানে বাস করছেন, তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যেন জাপান সরকার শত্রু-সম্পত্তি বলে গণ্য না করেন। ভারতের জাতীয় পতাকাই এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকা বলেই গৃহীত হবে এবং জাপান, থাইল্যাণ্ড ও অন্যান্য মিত্র রাজ্য যাতে এই পতাকাকে স্বীকার করেন তার জন্য সঙ্ঘ অনুরোধ জানাবেন। এই সব প্রস্তাব ছাড়া আর একটি প্রস্তাবের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হল, সেটি হোচ্ছে—এই সম্মেলন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পূর্ব

এশিয়ায় আনবার জন্য গভীরভাবে অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং যাতে তিনি নিরাপদে পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছিতে পারেন, সে সম্পর্কে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি ও প্রাসংগিক ব্যবস্থাদির জন্য জাপান সরকারকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এই সম্মেলনের পরেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলতে থাকে। প্রথমে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কার্যালয় ব্যাংককে থাকে। পরে ১৯৪৩ অব্দের এপ্রিল মাসে সিংগাপুরে স্থানান্তরিত হয়। ক্যাপ্টেন মোহন সিং আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ থেকে প্রধান সেনাপতি (General Officer Commanding) নির্বাচিত হ'য়ে মালয়ে যে সব ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাঁদের নিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করলেন।

এমন সময় ভারত-ব্রহ্ম-সীমান্ত থেকে ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর সহকারী মেজর ডিলন (কর্ণেল গুরু বক্স সিং ডিলন নয়) পালিয়ে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করলেন। লেঃ কঃ এন. এস. গিল সন্দেহজনক চালচলনের জন্য জাপানী কর্তৃক গ্রেপ্তার হলেন। মোহন সিংএর সঙ্গে এই সময় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর মতানৈক্যতা হলো। মোহন সিং আই. এন. এ. ভেঙে দেওয়ার জন্যেও চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু এই সময় তিনি জাপ-সরকার কর্তৃক বন্দী হওয়ায় আই. এন. এ. নষ্ট হতে বসলো। এক্ষেত্রে এ ব্যাপারে রাসবিহারী বসু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'লেন। তিনি শেষে সাব্যস্ত করলেন যে, আজাদ সঙ্ঘের মর্যাদা রক্ষার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সসম্মানে এনে তাঁর হাতে এর সর্বময় ভার অর্পণ করা। ১৯৪৩ অব্দের এপ্রিল মাসে সিংগাপুর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব সমর্থিত হওয়ার ফলে ২রা জুলাই সিংগাপুরে হলো নেতাজী সুভাষ-

চন্দ্রের শুভাগমন। তাঁর নামেই সবার অন্তরে নূতন আশা ভরসার সঞ্চার হল—জনসাধারণ গঠনশক্তি সম্পন্ন জননেতার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ নূতন জীবনে উজ্জীবিত হোয়ে উঠলো। একবাক্যে তাঁরা নেতার আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত করে ধন্য হ'লেন। সেই দিন থেকেই স্থভাষচন্দ্র হ'লেন তাদের বন্ধু, সহচর, প্রিয়তম নেতাজী।

সঙ্ঘের সভাপতির আসন অলংকৃত করে নেতাজী যে দীর্ঘ বাণী দিলেন, তা অপূর্ব—নিখিল বিশ্বের ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় বাণীগুলির মতন চমকপ্রদ। তিনি বললেন—"মুক্তির উষা যখন সন্নিকটে, তখন নিজেদের একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে সেই গভর্ণমেণ্টের পতাকাতলে থেকে শেষ সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হওয়া ভারতবাসীদের কর্তব্য। কিন্তু ভারতের নেতৃগণ কারাগারে, জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ অবস্থায় ভারতের মধ্যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা, অথবা সেই গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানো সম্ভবপর নয়। অতএব পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের কর্তব্য স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ দেশ প্রেমিক ভারতীয়গণের সমর্থনে আজাদ হিন্দ্ (স্বাধীন ভারত) অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা এবং সঙ্ঘের দ্বারা সংগঠিত মুক্তিফৌজের (আজাদ হিন্দ্ বাহিনী বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী) সাহায্যে স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রাম পরিচালিত করা। পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের দ্বারা সংগঠিত আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেই কর্তব্যভার গ্রহণ করছি। আমরা প্রার্থনা করি, বিধাতা আমাদের কাজে ও আমাদের মাতৃভূমির মুক্তি-সাধনের সংগ্রামে আমাদের আশীর্বাদ করুন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য, তাহার কল্যাণের জন্য এবং পৃথিবীর

জাতি সমূহের মধ্যে তাকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করবার জন্য আমরা ও আমাদের সহকর্মীরা জীবনপণ করছি।"

এর পর নেতাজী ভারতের প্রতি আনুগত্যের শপথ এইভাবে গ্রহণ করলেন—"ভগবানের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি সুভাষচন্দ্র বসু ভারত ও আমার ৩৮ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পবিত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাবো। আমি সতত ভারতবর্ষের সেবক হ'য়ে থাকবো, এবং ৩৮ কোটি ভারতীয় ভ্রাতা ভগিনীর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবো। আমার পক্ষে এই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। স্বাধীনতা অর্জনের পরও ভারতের স্বাধানতা রক্ষার জন্য আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবো।"

আজাদ হিন্দ্ অন্যান্য সঙ্ঘেরাও ভারত ও নেতাজীর প্রতি আনুগত্যসূচক শপথ করে জনসাধারণের উৎসাহকে উদ্দীপিত করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে নেতাজী যে সব বাণী দেন, তার প্রতি শব্দটি প্রত্যেক সৈনিকের অন্তরে নূতন প্রেরণা দেয়। কতিপয় বিখ্যাত বাণী এখানে উল্লেখ করা গেল—

নেতাজীর বাণী

I. India freed means humanity saved.
2. Give me blood, I promise you freedom.
3. Freedom knows no compromise.
4. Sacr fice everything, be a fakir.
5. India demands revenge.
6. India shall be free and before long,

7. The power that could not prevent me from getting out of India can not prevent me from getting in.

8. When I think the atrocities perpetrated by the British Government in 1857 and thereafter my blood begins to boil. If we are men enough we shall see to it that the heroes of 1857 and thereafter are rightly avenged.

9. If you want to see your countrymen to the heights of superhuman spirit, you should teach them not only to love their country but also to hate the enemy.

10 If we are ready to give blood, then only we can demand blood out of the enemy.

11. There is no such Indian leader who can demand to have many sided experience that which I have.

12. Undoubtedly British Government is the most cunning Government of the world. If that Government has failed to demoralise me and to coax or coerce me in imprisoning me eleven times, then there is no other Government in the world who can demand to do so.

13. If you were to read the story of my travelling you would think that you were reading a novel of SHERLOCK HOLMES.

14. On the ashes of British Imperialism there will emerge a free and prosperous India.

15. Battle cry :—'Chalo—Delhi.' or On to Delhi.
Blood—Blood and Blood.

16. Azad Hind Fauj is an organisation of fakirs.

17. স্বাধীনতার দাম রক্ত।

18. স্বাধীনতা চায় তার বেদীমূলে আত্মবলিদান, স্বাধীনতা চায় তোমার শক্তি, তোমার সম্পদ, তোমার যা কিছু মূল্যবান, যা

কিছু তোমার আছে। অতীতের বিপ্লবীদের মত তোমাকে তোমার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ সব ত্যাগ ক'রতে হ'বে। স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আজ শুধু সৈনিকই চান না—তিনি চান বিদ্রোহী নর, বিপ্লবী নারী, যারা আত্মঘাতে দ্বিধা করে না—মৃত্যুকে নিশ্চিত বলে জানে, যারা নিজের রক্ত ধারায় শত্রুকে নিমজ্জিত ক'রতে প্রস্তুত।

19. কে তোমরা আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। আমি তোমাদের উপযুক্ত সমর সজ্জা,—ক্ষুধায় অন্ন,—পোষাক, রোগে ঔষধ দিতে পারবো না। পারবো শুধু তোমাদের জোর করে যুদ্ধ সীমান্তে পাঠাতে—কিন্তু দেশ স্বাধীন হ'লে, ভগবানের কৃপায় তোমরা যদি বেঁচে থাক—তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ ক'রতে পারবে।

20 আমরা যখন দাঁড়াবো, আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে প্রস্তর প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াতে হ'বে ; আমরা যখন অগ্রসর হ'বো, আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে ষ্টীম রোলারের মতন অগ্রসর হ'তে হ'বে।

নেতাজীর বাণীর বাংলা অনুবাদ—

১। ভারতের মুক্তি অর্থ মানবতার মুক্তি।

২। আমাকে তোমরা রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।

৩। স্বাধীনতা আপোষ মীমাংসা জানে না।

৪। যা আছে সর্বস্ব দাও, ফকির হও।

৫। ভারতবর্ষ চায় প্রতিশোধ।

৬। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে—এবং তা শীঘ্রই হবে।

৭। যে শক্তি আমাকে ভারতবর্ষের বাইরে আসতে বাধা দিতে পারে নি, সে শক্তি ভারত প্রবেশের সময়ও আমায় বাধা দিতে পারবে না।

৮। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ সরকার নৃশংসতার যে কুৎসিত লীলা দেখিয়েছিলো তা ভাবলে আমার রক্ত উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। আমরা যদি মানুষ হই তা'হলে ১৮৫৭ সালের ও পরবর্তী বীরনায়কদের ওপর অনুষ্ঠিত নৃশংসতার যথোচিত প্রতিশোধ যাতে নেওয়া যায়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখবো।

৯। মনুষ্যত্বের চরম শিখরে দেশবাসীকে দেখবার যদি ইচ্ছা হয়—শুধু তাদের দেশকে ভালবাসতে শেখালে চলবে না শত্রুকে ঘৃণা করতেও শেখাতে হবে!

১০। রক্ত দেবার জন্যে আমরা যদি প্রস্তুত থাকি একমাত্র তবেই শত্রুর রক্ত আমরা পেতে পারি।

১১। এমন কোনো ভারতীয় নেতা নেই, যিনি আমার চেয়ে বহুমুখী অভিজ্ঞতার দাবী করতে পারেন।

১২। বিটিশ গভর্ণমেণ্টই যে জগতের মধ্যে ধূর্ততম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; সেই গভর্ণমেণ্ট যখন আমাকে এগার বার কারারুদ্ধ করে এবং নানাপ্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের দ্বারাও আমাকে ভগ্নোদ্যম কর্তে পারে নি, তখন জগতের কোন গভর্ণমেণ্ট ইহা কর্তে পার্বে না।

১৩। আমার পলায়ন কাহিনী যদি তোমরা পড়তে পারতে, তোমাদের মনে হ'তো 'শার্লক হোমসের' উপন্যাস পড়ছো।

১৪। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভস্মস্তূপের ওপর এক স্বাধীন মহান ভারত গড়ে উঠবে……।

১৫। রণ আহ্বান:—চলো দিল্লী অথবা দিল্লী চলো। রক্ত, রক্ত —আরো রক্ত।

১৬। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ফকিরদের প্রতিষ্ঠান।

ON TO DELHI.

"There-there beyond those jungles—beyond those hills—beyond those rivers lies our promised land—the land from where we sprang—the soil where we shall return now. Hark India is calling—India's metropolis Delhi is calling—three hundred and eighty eight millions of our countrymen are calling—blood is calling to blood. We have no time to spare. We shall march along the path, that our pioneers have built. We shall carve through the ranks of the enemy and if God wills we will die a martyr's death and in our last breath we will kiss the road which will lead our army to Delhi. The road to Delhi is the road to freedom : Chalo—Delhi."

Netaji.

নেতাজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘের সর্ব সংকটের অবসান হ'ল। যে জাপান-সরকার সঙ্গে সঙ্গে চাতুরী খেলছিলেন, এখন মুখোস একেবারে খুলে ফেললেন। সরকার এক ঘোষণা দ্বারা সঙ্ঘ তথা আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নিলেন এবং সম্ভবতঃ সকল প্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন কি, ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থনের প্রমাণ স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পণ করলেন।

নেতাজী এবার আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন এবং বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ গ'ড়ে তুললেন। তার মধ্যে করিৎ-কর্মা, মৃত্যুভয়হীন, দুঃসাহসী এবং সুচতুর কর্মীদের বেছে নিয়ে তাদের শিক্ষিত ও পটু করে তোলবার নির্দেশ দিলেন। এই বিভাগটি বাহিনীর **বাহাদুর দল** নামে পরিচিত হলো। শত্রু শিবিরে অতর্কিতে প্রবেশ

করে সংবাদ সংগ্রহ করা, কোথায় কি ভাবে শত্রুদের রসদপত্র থাকে, সাপ্লাই ব্যবস্থা কি ভাবে চলছে, এ সব সংবাদ সংগ্রহের ভার পড়ে এই দলের ওপরে। ওপর থেকে নির্দেশ এলেই এদের বেরিয়ে পড়তে হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধানে—পিছনের দিকে তাকাবার অবসরও থাকে না তখন। এমন কত কঠিন কাজের ভার নিয়ে মৃত্যুমুখে যাত্রা করতে হয়েছে জীবনকে সংকল্পসিদ্ধির আবরণে বেঁধে—তার কাহিনী শুনলে অবাক হ'তে হয়। এই অদ্ভুত কর্মা বাহাদুর দলের সদস্যরূপে বাঙলার তরুণবীর **শ্রীনিতাইলাল বসু** নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অসীম স্নেহ, গভীর বিশ্বাস ও প্রচুর প্রশংসাভাজন হোয়ে দুঃসাহসী, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল বাঙালী যুবদলের মুখোজ্জ্বল করেছেন সন্দেহ নেই। শত্রুপক্ষের অস্ত্রাঘাতচিহ্নে সর্বাঙ্গ অলংকৃত করে কর্তব্য-পালনের গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই নেতাজীর স্বহস্ত প্রদত্ত কর্তব্যনিষ্ঠ দুঃসাহসী সৈনিকের প্রাপ্য দুর্লভ মানপত্র **'সনদে বাহাদুরী'** ধারণ করে ইনি জীবনকে ধন্য করেছেন এবং বাঙালী জাতি এজন্য গর্ববোধ করবেন সন্দেহ নেই। সেই সনদে বাহাদুরী সম্পর্কে সম্প্রতি লিখিত ঝান্সি রাণী বাহিনীর লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের চিঠিখানি এখানে মুদ্রিত করা হোল।

TRUE COPY

Indian National Army Relief Committee, Madras.

Tele— {Gram. "Congress" / Phone—86361.

8, Narasingapuram Street,
MOUNT ROAD.
Madras, 10th July, 1946.

This is to certify that S. O., N. L. Bose is very well known to me. He was a member of the famous No I Bahadur Group of the I. N. A. in which he rendered valuable and meritorious service. For the above service he has been awarded the decoration of SANAD-E-BAHADURI by his Excellency NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE. While on active service in the Imphal Front, he was wounded badly in the leg and admitted into the Advance Base Hospital in Maymyo. There I had the opportunity to personally know S. O., Bose and I was impressed by the sincerity and utmost devotion and loyalty to our causes. Even though seriously wounded he made little of his sufferings and had but one thought—that was to be sent back to the front. I am confident that now he has come back to his motherland he will devote himself to the cause of our INDEPENDENCE.

"Jai Hind".

Lakshmi Swaminathan
Lt. Col., Indian National Army.

"সাব অফিসার মিঃ এন. এল. বসু আমার নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি আই. এন. এ.র প্রসিদ্ধ ১নং বাহাদুর গ্রুপের সভ্য ছিলেন এবং তার অমূল্য ও বিচক্ষণ কর্মকুশলতা সবার পরিচিত। মহামান্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর কাজের জন্য **'সনদ-ই-বাহাদুরী'** উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইম্ফল ফ্রণ্টে তিনি পায়ে ভীষণভাবে আঘাত পান এবং মেমিওতে 'এ্যাডভান্স বেস' হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমার জানার সুযোগ হয় এবং তাঁর সততা ও আনুগত্যে আমি খুব মুগ্ধ হই। যদিও তাঁর আঘাত খুব সাংঘাতিকই হয়েছিল, তবুও তাতে তিনি মোটেই কাতর হন নি এবং কত তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ফ্রণ্টে যেতে পারবেন এই একমাত্র চিন্তাতেই তিনি অভিভূত থাকতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখন তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করবেন।"

জয় হিন্দ্

লক্ষ্মী-স্বামীনাথন

লেঃ কর্ণেল, আজাদ হিন্দ বাহিনী।

নিতাইলাল শুরু থেকে অর্থাৎ যে সময় ভারতীয় সেনাদল সিংগাপুরে জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে—সেই সময় সামরিক কর্মচারীরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরবর্তী ঘটনারাজি—ইম্ফলের যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীরূপে দিল্লীর লাল কেল্লায় অবস্থিতি পর্যন্ত—প্রত্যেক ব্যাপারের শুধু যে ইনি প্রত্যক্ষদর্শী তা নয়—বিশিষ্ট অংশও গ্রহণ করতে হয়েছিলো এঁকে। সেই সকল কাহিনীর ওপরেই এঁকে আলোকপাত করতে হয়েছে। **বর্ত্তমান খণ্ডে**

সিংগাপুরে যুদ্ধের সূচনা থেকে ইম্ফলের যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনাবলির যেভাবে রূপায়ন করা হয়েছে, ছন্নছাড়া সৈনিকের পক্ষেই তা সম্ভব। **দ্বিতীয় খণ্ডে—ইম্ফলের পরবর্তী বিপর্যয়ের চমকপ্রদ ঘটনা-রাজির সঙ্গে নেতাজী এবং তাঁর সহকর্মীদের জীবন যাত্রার বিস্তৃত কাহিনী এমনি নূতন ভঙ্গিতেই চিত্রিত করা হয়েছে।**

মুক্তিলাভের পর এঁর মুখে মুক্তি-সংগ্রাম ও সংগ্রামিকদের সম্বন্ধে অনেক নতূন কথা শুনে বিখ্যাত বুক করপোরেশনের কর্তৃপক্ষগণ সেগুলি গ্রন্থাকারে ছেপে বার করবার জন্যে আগ্রহান্বিত হন। এই সময় "তোমাদের সুভাষচন্দ্র" নামে নেতাজীর জীবন চিত্রখানি বিশেষভাবে জনাদৃত হওয়ায় বিশেষজ্ঞ ভেবে তাঁরা আমার সঙ্গে শ্রীমানের সংযোগ করে দেন। প্রবীণে ও নবীনের সমন্বয়ে বিচিত্র পরিবেশে গড়ে উঠেছে এই সামরিক চিত্র। এই প্রসঙ্গে আমার আর এক স্নেহভাজন সহকর্মী সুলেখক শ্রীমান বিমল করের নামটিও উল্লেখ না করে পারছিনে। এই শ্রমবহুল কাজে তাঁর সহায়তাও সস্নেহে স্বীকার করছি। ইতি—

বাগবাজার, কলিকাতা

মহালয়া, ১৩৫৩

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি-সংগ্রামে বাঙালী সৈনিক

(১)

সীমাহীন সমুদ্র ·· · ···

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মুক্তবিহঙ্গের মতন চোখ দিয়েছি মেলে, তার সঙ্গে মন চলেছে ভেসে।

একটু আগে সাগরের গভীর নীল জলে সোনা ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেছে। এখনো সে রঙ রয়েছে ঢেউয়ের মাথায়। আশ্চর্য, একটাও পাখী নেই আকাশে। আমরা কি অনেকদূরে ফেলে এসেছি কলম্বো? মাঝ সাগরে যে আকাশ চোখে পড়ছে সে আকাশে পাখী নেই,. কিন্তু পাখীর বদলে রয়েছে ধোঁয়া। কাছাকাছি অন্যান্য জাহাজগুলোর চোঙা দিয়ে রাশি রাশি পাংশুকুটিল ধোঁয়া উঠে সমুদ্রের সতেজ আকাশ বাতাসকেও বিষাক্ত করে তুলেছে।....অকস্মাৎ মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কবিতার এক কলি—

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস!"

সুন্দর! কবি যা বলেছেন তাইতো দেখছি আজ নিজের জীবনে। কোথায় গেলো সেই সহজ স্বাভাবিক সভ্যতা? মানুষ চাইলো বুদ্ধি দিয়ে শান্তি কেনবার ক্ষমতা। বুদ্ধি দিয়ে সুখ এলো, কিন্তু শান্তি?

আজকের সভ্যতা জীবনকে অনেক স্বপ্নময় রঙীন করেছে, কিন্তু শান্তি দিতে তো পারে নি! সুখ আনতে গিয়ে এসেছে বিজ্ঞান, এসেছে ক্ষমতার দর্প। তাইতো আজ যেখানে সমস্ত মানুষ-সমাজের সুখী হবার কথা, সেখানে কজন মুষ্টিমেয় হয়ে উঠেছে আত্মসুখী, ক্ষমতাবান, গর্বিত। এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, ক্রুজার, সাবমেরিণ···,জানি এ সবই বিজ্ঞানের জয়, মানুষের জয়; কিন্তু এ জয় তো অর্থপতির কাছে বিক্রীত; ধনপতির ক্ষমতা আর আত্মস্ফীতির উপায়। সেই আত্ম-স্ফীতি-লোভ আর ক্ষমতার জন্যেই আজকের মাঝ সাগরের বুকে জাহাজ চলেছে ধোঁয়া উড়িয়ে, জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি গভীর নীল সমুদ্র। · অথচ সমুদ্রের এ-রূপ দেখবার স্বপ্ন তো আঁকিনি মনে। জানতাম যে-সমাজের লোকেরা জাহাজে ক'রে সমুদ্র ভ্রমণে বেরোয়, দেশ বিদেশ ঘুরে আসে, আমি সে সমাজের নই। আমি সেই শ্রেণীর, যারা কোন রকমে জীবন ধারণ করলেও সত্যিকারের উপবাসী—মনে, প্রাণে, দেহে, উদরে, শিক্ষায়, সব দিকে রিক্ত। তবু আজ এই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছি। সত্যি ভাগ্য! যুদ্ধ না লাগলে এ ভাগ্য কি ধরা দিতো?···হঠাৎ উড়ে আসা এই ভাগ্যটার কথা মনে আসছে···কি ছিলাম, কি চেয়েছি, আর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি···।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস, উইরোপে যুদ্ধ লাগলো! জার্মাণি আর তার নায়ক হিটলার আলাউদ্দীনের প্রদীপের মতন জগতশুদ্ধ সকলকে চমক লাগিয়ে একের পর এক তার কাছাকাছি দেশগুলোর বুকের ওপর ফ্যাসিষ্ট্ বুট চাপিয়ে দিলো।

দেখতে না দেখতে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো যুদ্ধের বিষ। এ যুদ্ধের ঢেউ এসে লাগলো ভারতবর্ষে। তারপর সেই ঢেউ আরো

ছড়িয়ে পড়লো ভারতবর্ষের সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, আনাচে কানাচে। জীবন ধারণের ভিত্তিতেও নাড়া লাগলো। আমরা যারা দৈনন্দিন জীবনটাকে কোন রকম কায়ক্লেশে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, বুঝলাম এবার আর চলবে না, কোথায় যেনো ফাটল দেখা দিয়েছে। সে ফাটল আর কিছু নয়—অর্থনৈতিক ফাটল। যুদ্ধ লেগে বাজার গেছে চড়ে, উদর পুরণের জন্যে যা নিতান্তই প্রয়োজন সেটুকুও জোটে না। আমার বেকার মনে আত্মাভিমানটা বড় বেশি ক'রে দেখা দিল। এ বাজারে অপদার্থ বেকার হ'য়ে বসে আত্মীয় স্বজনের অতিকষ্টার্জিত অন্ন মুখে তুলতে আমার পৌরুষে আঘাত লাগলো। উপার্জন আমায় কোরতেই হবে স্থির ক'রে ফেললাম।

চাকরি চাই—একটা চাকরি—যে কোনো রকমের একটা চাকরি। এক বন্ধু উপদেশ দিলো যুদ্ধে নাম লেখাতে। ভাবলাম মন্দ কি? ফ্যাকাসে, বিবর্ণ হ্য়ে যাওয়া এ বেকার বাঙালী জীবনে কেমন একটা বিস্বাদ এসে গেছে। যাই না কেনো যুদ্ধে। সেখানে আস্বাদ করে আসি খানিকটা রোমাঞ্চ, মুখরিত জীবন, আর যৌবন সুলভ চাঞ্চল্য। এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গে অভিজ্ঞতা আর নতুনত্বের স্বাদ।

১৯৪১ সালের ২৯শে মে। মে রোডে (কলকাতায়) যুদ্ধে লোক নেবার একটা অফিস খোলা হয়েছিলো; আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আগে যা ভেবেছিলাম, অর্থাৎ গেলেই বুঝি একটা কিছু হয়ে যাবে—দেখলাম ঠিক ততোটা সোজা জিনিস নয়। প্রথমতঃ আমারই মতন বেকারের সংখ্যা সেখানে এতো প্রচুর যা দেখলে রীতিমত আতঙ্কিত হ'তে হয়। সেই ভিড় ঠেলে রিক্রুটিং অফিসারের সামনে হাজির হওয়া সময় সাপেক্ষ। আমার বেলায় অবশ্য বিশেষ দেরী করতে হয় নি; কারণ এ সব ব্যাপারে তাড়াতাড়ি 'অফিসারের'

সামনে যেতে হ'লে যে বুদ্ধি এবং সুযোগটুকু গ্রহণ করতে হয়, সৌভাগ্য বশতঃ আমি তা করেছিলাম। তাড়াতাড়ি ওপার্ট চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম···। বাইরে এসে বুঝলাম অনেকগুলো বেকার চোখ আমার সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করছে। পরের দিন 'হেলথ্ এক্‌জামিনেশনের' তলব পকেটে পুরে ফিরলাম।...

৩০শে মে আলিপুর সামরিক হস্‌পিটালে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হয়ে গেলো।

তারপর প্রায় দুটো মাস কোন খোঁজ খবর নেই। আমি যে 'সিলেক্‌টেড্' হয়েছি এ কথাটা জানতাম, এবং আমাকে যে ডাকা হ'বে সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু অপেক্ষা ক'রে ক'রে যখন ২৩শে জুলাই পর্যন্ত কেটে গেলো, তখন মনে মনে বেশ খানিকটা নিরাশ হ'য়ে পড়লাম। পরের দিনই আবার হাজির হ'লাম 'মে রোডের' অফিসে। জনৈক ক্লার্কের সঙ্গে দেখা ক'রে সবিস্তারে তাঁকে জানালাম ব্যাপারটা।

"কাল আসবেন—, কালই সব ঠিক ক'রে দেবো"—ভদ্রলোক ব'ললেন। ভেঙে পড়া মনটা আবার জোড়া লাগলো ভদ্রলোকের কথায়। ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

পরের দিনে ২৫শে জুলাই সময়মত হাজির হলাম 'মে রোডের' অফিসে।' অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্ এলো 'রিক্রুটিং অফিসারের' ঘর থেকে।...কতকগুলো ব্যক্তিগত প্রশ্ন ক'রলেন তিনি; যেমন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইত্যাদি। যথাযথ উত্তর দিয়ে তাঁকে খুশি ক'রতে পেরেছিলাম ব'লেই আমার ধারণা। প্রশ্নের শেষে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে সই ক'রতে ব'ললেন তিনি। বুঝলাম সেটা 'বণ্ড'। একমুহূর্ত মনের কোথায় কোন্

কোণে যেনো শঙ্কার একটু ছায়া জাগলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে শঙ্কাটুকু বাইরে সামান্য মাত্র প্রকাশ পায় নি।

'বণ্ড' সই ক'রে দিলাম···। 'বণ্ড' সই ক'রতে আমার ভেতর যে সামান্য মাত্র দ্বিধা জাগে নি, সেটা প্রমাণ করতে খুব জোরে বড় বড় করে সই টেনে দিলাম।

চাকরি হ'য়ে গেলো। Store-Keeper-এর চাকরি। ঐ দিনে 'হাওড়া' স্টেসনে হাজির হবার আদেশ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

যুদ্ধের নামে ভয় পাওয়া সাধারণ মানুষের স্বভাব। বিশেষ ক'রে আমরা বাঙালীরা যারা কয়েক যুগ ধরেই নির্বিঘ্ন উত্তেজনাহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাদের পক্ষে যুদ্ধের উত্তেজনা রীতিমত ভীতিজনক। সত্যি কথা বলতে কী, এ্যাড্-ভেঞ্চারের মন আমাদের নয়। এ্যাড্‌ভেঞ্চার সহ্য করতে পারি যদি সে এ্যাড্‌ভেঞ্চার হয় দল বেঁধে বাগান বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া, বটানিক্যাল গার্ডেনে প্লেজার-ট্রিপ দেওয়া, বড় জোর ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সিনেমা দেখতে যাওয়া। আজ যদি কেউ আমায় বলেন— যে সব বাঙালী যুদ্ধে গিয়েছিলো তারা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের লোভেই গিয়েছিলো আমি বলবো সেটা নির্জলা মিথ্যে কথা। শতকরা পাঁচজনের হয়তো সে স্পিরিট থাকতে পারে; কিন্তু বাদ বাকি পঁচানব্বই জনের যাওয়ার মধ্যে শাসনতন্ত্রের বাধ্য বাধকতা ছিলো। আগেই তো বলেছি সে বাধ্য বাধকতা উদরের।···যাই হোক্, যাবার জন্যে এতোদিন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেও যে দিন সত্যিকারের যাবার সময় এলো সে দিন কেমন যেনো মুষড়ে পড়লুম।

আত্মীয় স্বজনেরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন, তাঁদের উদ্বিগ্নতা আমার নানারকম দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি ক'রতে লাগলো।



জনৈক আত্মীয় তো পরিচিত এক পুলিশ-অফিসারের স্মরণাপন্ন হ'লেন, আমায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে। অবশ্য পুলিশ অফিসারটি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। তা ছাড়া আমার মঙ্গলের জন্যেই তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করা হ'য়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত আত্মীয় স্বজনেরা আশা ছেড়ে দিলেন। আমি তখন অদ্ভুত দুই বিপরীত ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। একদিকে অতি পরিচিত আত্মীয়স্বজন, তাঁদের স্নেহ-প্রীতি, তাঁদের ঘনিষ্ঠতা, নিঃশঙ্ক জীবন—অন্য দিকে সম্পূর্ণ এক নতুন ঢেউ···যার সঙ্গে কল্পনারও কোনো বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। যুদ্ধক্ষেত্র—? সে কেমন, কোথায় যেতে হ'বে! সেখানের জীবন যাত্রা হয়তো নিদারুণ কষ্টকর। আর আছে অকল্পনীয় লক্ষ রকমের আশঙ্কা।

যতো ভাবি মনে মনে ততো বেশি ভীত হ'য়ে উঠি। আর কি ফিরে আসতে পারবো এই আত্মীয়স্বজনের মাঝে, আমার পূর্বপুরুষের অধ্যুষিত এই দেশে! কী জানি?

বিকেল গড়িয়ে গেলো। যাবার সময় হ'য়ে এসেছে। মন থেকে জোর করে সব দুশ্চিন্তা মুছে দেবার চেষ্টা ক'রলাম।

"Half a league, half a league, half a league onward.
Rode into the valley of death
Rode the six hundred"—

জনৈক বন্ধু কবিতাটা আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে ঘরে ঢুক্‌লো।

'কি রে, যাবি না—?'

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে হয়তো বুঝলো আমি কিছু বিচলিত হ'য়ে পড়েছি।

'কিরে, ভয় পেয়ে গেলি নাকি?'

'ভয়—? না, ভয় পাই নি।'

তবে অমন মনমরা হ'য়ে বসে আছিস কেন··· ?

'অনিশ্চিত দিনের জন্যে প্রবাসে যাওয়া—তাই হয়তো···' ম্লান মুখে বোললাম।

'ভবিষ্যতটা বাড়ীতেও যেমন অনিশ্চিত, প্রবাসেও তেমনি। কবে কি হ'বে তার জন্যে আজকে দুশ্চিন্তা ক'রে মনখারাপ করাটা তোর মতন ছেলের সাজে না। After all war is the greatest adventure in this reality ! তৈরি হয় নে, সময় হ'য়ে এসেছে—!"

'তৈরী তো আছি !'

'জিনিস পত্তর ?'

'যৎসামান্য নেবার হুকুম দিয়েছে। লক্ষ্ণৌতে গিয়ে ড্রেস্ ইত্যাদি সবই পাবো।'

সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। আর দেরী করা চলে না। শেষবারের মত আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

হাওড়া স্টেশনে এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হ'লো। বন্ধুবরটি বিদায় দিতে এসেছিলেন।

আমাদের গাড়ী প্লাটফর্মে 'ইন্' করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদায় নিলেন। আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ব'ললেন—"Wish you luck !" তারপর আর মূহূর্ত মাত্র দেরী না ক'রে তিনি বিদায় নিলেন। মানুষ কী কোমল ?

আটটা চল্লিশে ডেরাডুন এক্সপ্রেসের যাত্রী হলাম আমরা···। আমার সমগোত্রীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনেকটা সাহস পেলাম। আর আশ্চর্য, আমাদের কথাবার্তা অতিরিক্ত অন্তরঙ্গের মতো জমে

উঠতে একটুও দেরী হলো না। যেনো সকলেই সকলের অনেকদিনের পরিচিত। বুঝলাম অবস্থাই মানুষকে গড়ে তোলে।

ট্রেণ ছুটে চললো। জানালা দিয়ে মুখ বের করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে র'য়েছি।···বারবার মনে প'ড়েছে পেছনে ফেলে আসা আত্মীয় পরিজনের মুখ। কামরার ভেতোর বহুজনের কলগুঞ্জন কানে আসছে। সঙ্গীরা কথা বলছে, হাসছে, গান গাইছে। যেনো জীবনটার এই সবটুকুই তাদের কাছে ভীষণ সত্যি। অতীত বা ভবিষ্যৎ তাদের কাছে একেবারেই অর্থহীন, মিথ্যে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্ণৌয়ে পৌছানো গেলো। আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'লো হাঁসপাতাল বিভাগের ট্রেনিং কেন্দ্র দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে (2nd Bn. * I. H. C. পরে I. A. M. C. †). বিরাট এক মাঠ, কোথাও ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই। ইঁট দিয়ে অস্থায়ী কতকগুলো সেনাব্যারাক তৈরী করা হ'য়েছে। সমস্ত জায়গাটার মধ্যে কেমন একটা কঠিন রুক্ষতা।.. সে দিন সেখানেই রাত কাটাতে হ'লো—সেই ধূলোর ওপরে, মেঝেয় শুয়ে। খাবার ব্যাপারটা আরো কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ালো। বড় বড় আধসেদ্ধ পোড়া রুটি আর বিস্বাদ তরকারী। বলা বাহুল্য বাঙালীর ডিস্‌পেপ্‌টিক পেটে অমন সুখাদ্য সহ্য না হ'লেও আমার হ'য়েছিলো। খেয়েছিলাম কিনা, সেটা আন্দাজ ক'রতেই পারেন!

···আশা করেছিলাম আমরা বোধ হয় শীঘ্র অন্য কোথাও চলে যাবো। কেন না এরকমভাবে থাকাটা নিতান্তই কষ্টকর—! হায়, আমার সে আশার ভুল ভাঙতে মোটেই দেরী হলো না।

---

* Indian Hospital corps.

† Indian Army Medical corps.

দুচার দিন যেতে না যেতেই আমাদের খাবার এবং থাকার নিয়মগুলো জানতে পেরেছিলাম। সকালে মাছ ধোওয়া জলের মত চা, দ্বিপ্রহরে ভাতরুটী ও তরকারি, আর বিকালেও উহার পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু ইংরেজ সৈন্যদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, তাদের জন্যে সকালে—Bed tea, একটু পরেই ব্রেকফাষ্ট—টোষ্ট মাখন, ডিম ও চা, দ্বিপ্রহরে লাঞ্চে—পাউরুটি, নানারকম মাংস, ডিম, জ্যাম, জেলি, সুপ্, পুডিং, কেক্, মাছ, ফল প্রভৃতি, বিকালে টিফিনে—চা, টোষ্ট, মাখন, ডিম প্রভৃতি এবং সন্ধ্যার পরে ডিনারে দ্বিপ্রহরের মত নানাপ্রকারের চব্য-চোষ্য, লেহ্য ও পেয় দিবার সুব্যবস্থাও ছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ ভারতীয় সৈন্যের জন্য এই যে পার্থক্য মূলক খাদ্যের ব্যবস্থা ইহা আমাদের মত—রাজনীতি-জ্ঞানহীন সৈনিকদের মনেও পরাধীন ভারতের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিত।

জন প্রতি খাবারের পরিমাণ ছিলো ১½ পাউণ্ড আটা আর চা'ল, ৩ আউন্স ডাল, ২ আউন্স তরকারি, ⅙ আউন্স চা, ২ আউন্স ঘি ইত্যাদি। আমাদের এবং ইংরেজদের মধ্যে যে প্রভেদ নাগরিক জীবনে দেখেছি, ঠিক সেই প্রভেদ সৈনিক জীবনেও দেখলাম। মনুষ্যত্বের দিক থেকেও এটা যে ন্যায্য নয় তাহা যে তারা বোঝে না, তা নয়। তারা বোঝে, কিন্তু স্বজাতি প্রীতিটা মনুষ্যত্ব বোধটাকে টুটি চেপে মারলেও সেইটেই তাদের পরম কাম্য!

লক্ষ্ণৌয়ে একমাস কেটে গেলো। সে সময়ে আমরা সৈনিক-জীবনের রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা করলাম। তারপর গেলাম ডেরাডুনে। ডেরাডুনে চারমাস কেটে গেলো। Store-Keeping আমি ভালোই শিখেছিলাম।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম যে, বহু অশিক্ষিত ভারতীয়কে 'সুইপারের' কাজ দেওয়া যাবে ব'লে সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি করা হ'য়েছে, কিন্তু তারা ইংরাজী সুইপার (Sweeper) কথার অর্থ জান্‌তো না। তাদের মেথর ও ঝাড়ুদারের কাজ দেওয়া হ'লে স্বভাবতঃই তারা ঐ কাজে আপত্তি জানাতো। কিন্তু যখন তারা নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝ্‌তে পারতো, অর্থাৎ কাজ না কর্লেই সামরিক কারাবাস—তখন সকল সংশয় ঝেড়ে ফেলে তারাই ঝাড়ু নিয়ে এগিয়ে যেতো। মানুষের দরিদ্রতা ও অজ্ঞতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমার জীবনে এই প্রথম দেখ্‌লাম।

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী আমি আবার ফিরে আসি লক্ষ্ণৌয়েতে। ১৮ই জানুয়ারী আমরা প্রায় দুশো জন সৈনিক লক্ষ্ণৌ ছাড়ি। মিলিটারী ব্যাণ্ড্ বাজিয়ে আমাদের স্টেসনে পৌঁছে দেওয়া হ'য়েছিলো। অনুমান করতে পেরেছিলাম—সেদিনকার ঐ উৎসবটির কারণ !

রাত দশটায় আমাদের গাড়ী ছাড়লো। কোথায় যাচ্ছি তা আমাদের জানানো হয় নি। জানবার কোনো অধিকারও ছিলো না।

পরের দিন সকালে ঝান্সী পৌঁছিলাম। এই সেই ঝান্সি—যেখানে মহারাণী লক্ষ্মীবাই বলেছিলেন—"মেরা ঝান্সি নাই দেওঙ্গে।" ঝান্সি আছে—সেই বীরনারীর সন্তানেরা আর নেই। এই ঝান্সির স্মৃতি মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর প্রসাদে আবার কিভাবে নবরূপে জাগ্রত হয়ে ওঠে যথাস্থানে তার কাহিনী বলা যাবে। সেখানে ২।১০ বেলুচি রেজিমেণ্টকে নিয়ে একখানা স্পেশ্যাল ট্রেণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ক্যাপ্টেন থিমাইয়া ছিলেন সেই স্পেশ্যাল

ট্রেনের অধিনায়ক। আমাদের অধিকৃত বগিগুলো সেই স্পেশ্যাল ট্রেণের সঙ্গে যুড়ে দেওয়া হ'লো।

গাড়ী আবার ছুটে চললো। সকাল পেরিয়ে দুপুর, সন্ধ্যে, রাত, তারপর আবার সকাল, গাড়ী ছুটেই চলেছে। অসহ্য কষ্ট হচ্ছিলো আমাদের। ঝান্সী থেকে ট্রেণ ছাড়বার সময় কিছু প্রাতরাশ করেছিলাম, তারপর আর কিছু জোটে নি। Kitchen van-এ চাল, ডাল, আটা, ঘি সব মজুত থাকা সত্ত্বেও আমরা অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হলাম। কেন না রান্না করবার জন্যে কোনো পাচক আমাদের সঙ্গে দেওয়া হয় নি। কোন একটা স্টেশনে ট্রেন থামলে আমরা যথেষ্ট বেশি দাম দিয়ে কিছু খাবার কিনলেও তা খেতে পারিনি। তার কারণ, ট্রেনের Second in Command ইংরাজটি আমাদের হাত থেকে খাবার নিয়ে ফেলে দিলেন। পরে বীনা ষ্টেসনে অবশ্যি খাবার কেনবার অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু বীনা পৌঁছে-ছিলাম তার পরের দিন। ঠিক বুঝতে পারি নি আগের দিন আমাদের হাত থেকে খাবার নিয়ে ফেলে দেবার কি কারণ থাকতে পারে!

বাজারের জিনিস খেলে সৈন্যদের শারীরিক ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় যদি সে দিন কেনা খাবার হাত থেকে নিয়ে ফেলা হয়ে থাকে, তা'হলে বীনা স্টেসনে আবার সেই বাজারের খাবার কেনবার অনুমতি দেওয়া হলো কেন? অথবা সৈনিক জীবনের উপবাস প্র্যাক্‌টিস্ করবার এটাই রীতি! যাই হোক ব্যাপারটা আজো বুঝতে পারি নি!

২১শে জানুয়ারী আমরা বোম্বে পৌছোই। কোলাবা নামক এক সৈনিক-শিবিরে ২ দিন থাক্‌তে হ'য়েছিলো। ২৩শে জানুয়ারী

সকালে 'কোলাবা' থেকে কুচ্‌কাওয়াজ্‌ করে বেলা প্রায় নটার সময় আমরা Ballard Pire নামক ডকে পৌঁছেছিলাম।

ষোলো হাজার টনের Devonshire নামক জাহাজের আরোহী হ'য়ে আমাদের সমুদ্রযাত্রা স্থরু হলো। আরো তিন খানা জাহাজ চললো সঙ্গে সঙ্গে।

কোথায় যাচ্ছি জানতাম না। কেউ বলে মধ্য প্রাচ্যে, কেউ বলে পুর্বে। দিন তিনেক পরে বুঝলাম আমরা পূর্বদিকেই চ'লেছি।

সমুদ্র যাত্রার চারদিন পরে কলম্বো থেকে আরো সাত খানা জাহাজ আমাদের সাথী হ'লো। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে ঘেঁষে জাহাজ চললো। কারণ বঙ্গোপসাগর তখন শত্রুর ডুবো জাহাজে ভরা। সমুদ্রের মধ্যে আমাদের জাহাজ চললো ভেসে, আর সে জাহাজগুলোকে নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্যে ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার, ইত্যাদি দিয়ে আগলে রাখা হ'লো।

"হ্যালো! কোয়ার্টার মাষ্টার ইজ কামিং"—কে একজন কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে।

চম্‌কে উঠলাম। অতীতের চিন্তাটুকু দমকা ঝড়ে শুক্‌নো পাতা ওড়ার মতন নিমিষেই মন থেকে মুছে গেলো।

সাগরের বুকে রাত্রি নেমেছে। অপরূপ, ভয়ালস্থন্দর রাত্রি। কিন্তু এ রাত্রি দেখবার আর অবসর নেই। আমি সৈনিক, আমি কবি নই।

কোয়ার্টার মাষ্টারের মূর্তি দেখতে পেলাম। এদিকে আসছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে এলাম।

সমুদ্র যাত্রা আরম্ভ করার বারোদিন পরে আমাদের সঙ্গী জাহাজগুলোর মধ্যে ছ'খানা জাহাজ জাভার দিকে চ'লে গেলো। বাকি পাঁচ খানা জাহাজ সিঙ্গাপুরের দিকে চললো।

আমি থাকলাম সিঙ্গাপুরের দলে।

ত্রয়োদশ দিন।

এ দিনটি জীবনে কোনোদিন ভুলবো ব'লে মনে হয় না। তখন বেলা বারোটা। হঠাৎ খবর ছড়িয়ে গেলো বিপদ আস্‌ছে।

মুহূর্তের মধ্যে আমাদের জাহাজগুলো প্রস্তুত হ'য়ে নিলো। এ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট্ কামানের লম্বা লম্বা মুখগুলো এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। যেনো ছট্‌ফট্ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ন খানা জাপানী বম্বার আমাদের জাহাজের মাথার ওপর এসে পড়লো।

আমাদের এ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট্ গর্জন করে উঠলো…জাপানী বোমাও সমুদ্রের জল তোলপাড় করে তুললো।

একটা খণ্ড যুদ্ধ। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের কোনো ক্ষতি হ'লো না, জাপানী বম্বার ফিরে গেলো নিজের জায়গায়।

চৌদ্দদিনের দিন—অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছোলাম। আমাদের সঙ্গে সবের শেষে আস্‌ছিলো Empress of Asia জাহাজখানা। বন্দরে ঢোকবার ঠিক আগে শত্রুর বোমায় সেটা ঘায়েল হ'য়ে ডুবে গেলো। সে জাহাজের লোক-জনকে বন্দরের লোকেরা যতদূর সম্ভব বাঁচিয়েছিল। সিঙ্গাপুরের ডকে আমাদের জাহাজগুলো নঙ্গর করলো। দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা হ'লো, তারপর রাত্রি। গভীর রাত্রিতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমরা জাহাজ থেকে নামলাম। অনেকগুলো লরী অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্যে। লরীতে করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পূর্বদ্বারের (Gate of the East) মধ্য দিয়ে একেবারে গভীর জঙ্গলে এসে থামলাম।

পূর্ব রণাঙ্গনের গোড়ার কথা ঃ

পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের কটু ধোঁয়া অনেকদিন থেকেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিলো। সাম্রাজ্যবাদী জাপান শ্যেন দৃষ্টিতে প্রশান্ত-মহাসাগরের ওপর তার দৃষ্টি রেখেছিলো। উপনিবেশ না বাড়াতে পারলে তার সাম্রাজ্যবাদী সমস্ত আশার মূল দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে ব'সেছে। জাপান যদি এশিয়ায় নিজেকে ইতিমধ্যে প্রসারিত ক'রতে না পারে, তবে তার কপালে আবার সুযোগ আসা অনিশ্চিত ব্যাপার।

ইয়োরোপে যুদ্ধ বেধে ওঠার পর থেকে খুব সতর্কভাবে জাপান অপেক্ষা ক'রে চললো। দু বছর পেরিয়ে গেলো। এই দু বছর পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা থেকে তার বুঝতে দেরী হলো না যে, বৃটিশ শক্তি নিতান্তই দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। সারা পৃথিবীময় তার উপনিবেশ ছড়ানো আছে সত্যি—কিন্তু ভোজন ব্যাপারটা হ'য়ে উঠেছে নিতান্তই বেশি—তাই ঠিক মতন পরিপাক করা তার স্বাস্থ্যে কুলোচ্ছে না। লক্ষমুখ দিয়ে সে গ্রাস করেছে; উপযুক্ত রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারে নি। আর জাপান কি ভুলে যাবে গত মহাযুদ্ধের কথা!

ইন্দোচীনে জাপানী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির উত্তরে আমেরিকাকে ছেলে ভুলানো উত্তর দিয়েই অতর্কিত আক্রমণ সুরু করলো জাপান। এটা অবশ্য ও পক্ষের কথা; জাপান দাবী করে যে, রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেই সে আক্রমণ সুরু করেছিল।

১৯৪১এর ৭ই ডিসেম্বর বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো জাপান।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ওয়াহু দ্বীপ, পার্ল হার্বারের নৌঘাঁটী,

ম্যানিলা প্রভৃতি জায়গায় এক সঙ্গে জাপানের আক্রমণ স্বরু হ'লো। এমন অতর্কিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণার আশা বৃটেন বা আমেরিকা করেনি। তা ছাড়া জাপানের শক্তি সম্বন্ধে তাদের বুঝি একটু ঔদাস্যই ছিলো। জার্মানির ব্লিৎস্ক্রিগ্ জাপান অনুসরণ করে প্রমাণ করলো তার শক্তি ও রণনীতি কোনোটাই তুচ্ছ করবার মতন বস্তু তো নয়ই, উপরন্তু আতঙ্কের বিষয়।

৮ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম সিংগাপুরের ওপর দু-বার বিমান আক্রমণ হ'য়ে গেলো। উত্তর মালয়ে জাপানী সৈন্য অবতরণ করলো। থাইল্যাণ্ডও আক্রান্ত হ'লো। ওয়েক দ্বীপ তারা দখল ক'রে ফেলেছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্যারাসুট সৈন্য নামিয়েছে জাপান......।

বিদ্যুতগতিতে জাপান আক্রমণ চালিয়েছে।

সারা জগতময় ছড়িয়ে প'ড়েছে তাদের এই বিস্ময়কর জয় ঘোষণা। বিস্মিত হ'য়ে লোকে ভাবছে জাপান কি যাদু জানে? ওইটুকু দেশ, যাদের সভ্যতার জন্ম আঙ্গুলে গুণে বলা যায় কতো বছর—তারা আজ এতো শক্তিমান ! একটা দেশ বটে—worthy to be praised !

অথচ এইই সময়, যখন জাপানী ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে, তখনও মিত্রশক্তির যোদ্ধ মহলে কোনো চাঞ্চল্য নেই।

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে গল্প শুনেছি—যেদিন জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলো, সেদিন যদি কেউ মালয়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মিত্রশক্তির উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীদের খোঁজ নিতো, তাহ'লে দেখতো চিরবসন্তের দেশ মালয়ের বাতাসে বারুদের গন্ধের আভাস মাত্র নেই। পূর্ব এশিয়ার বসন্ত সাগরপারের সাদা মানুষদের মন রাঙিয়েছে। সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোঁরা, কফি হাউসে তাদের ভীড়। রাত্রির রহস্য-ঘনতায় তারা রোমাঞ্চিত।

ফেনোচ্ছল সুরাপাত্র সামনে নিয়ে—নীলনয়নার চোখের পানে তারা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।···কন্‌সার্টের সুর ভাসছে সুগন্ধি বাতাসে। ক্ষণে ক্ষণে নাচের পালা, কন্‌সার্টের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম-বিলাসের গুঞ্জন!

যুদ্ধের খবর যখন সগৌরবে ঘোষিত হ'লো সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষও চমকে উঠলো। তখনও এদের মধ্যে সামান্য মাত্র চাঞ্চল্য নেই। কেনোই বা থাকবে? সীমান্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতন··· সদা আজ্ঞাবহ সনাতন প্রভুভক্ত কালা আদমী···বেশ ধারালো বেয়নেট্ হাতে, অতন্দ্র চক্ষে, শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুঃসাহসী জাপান কি এ কথা জানে না?

প্রশান্ত-মহাসাগরের আকাশ, জল যুদ্ধের কটু ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে গেলো।

থাইল্যাণ্ড, ওয়াক। জাপানীরা মালয় এবং হংকং আক্রমণের চেষ্টা করছে। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বাধা দেবার পর থাইল্যাণ্ড জাপানীদের পথ ছেড়ে দিলো। উন্মুক্ত বেয়নেট্ হাতে জাপানী সৈন্য থাইল্যাণ্ডের মাটিতে বুটের চিহ্ন এঁকে চ লে গেলো।

৯ই ডিসেম্বর। মালয়, ফিলিপাইনে জাপানী সৈন্য অবতরণ করেছে।

অতর্কিতে মালয়ের ওপর নেমে এলো যুদ্ধের করাল ছায়া। নিরীহ মালয়বাসী এমন আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। শান্ত স্থির জলে যেনো লক্ষ ঢেউ জেগে তাকে বিব্রত বিচলিত ক'রে তুললো। নির্মল নীল আকাশ ভ'রে উঠলো এরোপ্লেনের গর্জনে, এ্যাণ্টি এয়ারক্রাফ্‌টের ধোঁয়ায়।

অভাবনীয় আক্রমণ। বিস্মিত হবার পালা যখন শেষ হলো তখন এলো পালাবার পালা। ভীতার্ত, শঙ্কাকুল মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে

বাঁচবার জন্য পালাতে সুরু করলো। এক একদিনে একএকটি জনপদ খালি হ'য়ে যায়। পড়ে থাকলো ঘর বাড়ী, পড়ে থাকলো আজন্ম সঞ্চিত সংসার করার সঞ্চয়, পড়ে থাকলো অতিপ্রিয় সযত্নে সাজানো বাগান। উঠলো কলরব—'পালিয়ে চল, বাঁচতে চাই!'

প্রতিদিন সকাল দুপুর রাত যখন যে কোনো সময়ে মালয়ের আকাশে উড়ে আসে বোমারু বিমান। এক এক ঝাঁকে ষাট-সত্তর-আশী—নির্বিবাদে বোমা ফেলে। জ্ব'লে ওঠে বাড়ী, ক্ষেত, খামার —ভাঙে কারখানা, রেললাইন, সাঁকো।

নীচে গর্জায় সাইরেন ও এ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট আর ওপরে ওড়ে বিমান।

···বিদ্যুৎগতিতে জাপানী এগিয়ে আসতে লাগলো। এক একটা দিন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা, যার হিসেব কোনো কালে কেউ রাখে না, একটা দিনের যে সময় হিসেবে গুরুত্ব আছে, তা কোনোদিন যারা উপলব্ধি করেনি আজ তারাও বুঝতে পারলো এক একটা দিনই জগতের ইতিহাসে পতন ও অভ্যুত্থানের ইতিহাস রচনা করে চ'লেছে।

পার্ল হারবার, মালয়, ফিলিপাইন······মাত্র কটা দিন। কিন্তু মানচিত্র ও মানচিত্রের রঙ গেলো বদলে। কী বিরাট ওলট পালট হ'য়ে গেলো সে দেশের মাটিতে আর মানুষেতে।

আমরা সৈনিকরা যুদ্ধের দৈনন্দিন খবরাখবর নির্ভুলভাবে পাই না। বিশেষতঃ কোথায় কোথায় যে হারছি তা বোঝবার কোনো উপায় নেই। বরং যুদ্ধের খবরাখবর এমন ভাবে প্রচার করা হয় যাতে সব সময় আমরা ভাবতে পারি আমরা জিত্‌ছি।

থাইল্যাণ্ড অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের সুবিধা হ'লো—মালয়, বিশেষ ক'রে সিঙ্গাপুর আক্রমণ করবার।

১০ই ডিসেম্বর। সাইরেণের তীক্ষ্ণ শব্দ বাতাসকে চিরে ফেললে। বৃটিশ ফ্লাগশিপ 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস' আর ক্রুজার 'রিপালস্' ভাসমান দুর্গের মতন দাঁড়িয়ে। সাইরেনের শব্দে তারাও সচকিত হয়ে উঠলো। ...এড্মিরাল ফিলিপ্ বিস্মিত হয়ে আকাশের দিকে চোখ তুললেন।

অয়ারলেস অপারেটার হেড্ফোন কানে লাগিয়ে চমকে উঠলেন। বারশো কিলোমিটার পূর্বে এক ঝাঁক জাপানী বোম্বারু!

মুহূর্তের মধ্যে 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্' প্রস্তুত হয়ে নিলো। জাহাজের গোলন্দাজ সৈন্যরা এ্যান্টিএয়ারক্রাফ্টের দানবীয় লম্বালম্বা মুখগুলো আকাশ পানে মেলে ধরলো। তাদের চোখের দৃষ্টি ক্রুর—হাতের পেশীগুলো উত্তেজনায় কঠিন হয়ে গেছে।

আটশো কিলোমিটার......সাতশো।

'প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের' অধিনায়ক কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। ষোলো ইঞ্চি পুরু লোহার ইস্পাতে মোড়া 'প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্' আধুনিক উন্নত ধরণের সর্বরকম যন্ত্রপাতিতে সাজানো প্রিন্স্ অফ ওয়েলস্'—! অসম্ভব...'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্' ঘায়েল হ'বে জাপানী বোমায়! এড্-মিরাল ফিলিপ হয়তো মনে মনে ভাবেন—জাপানীরা কয়েকটা জায়গা দখল ক'রে বড় বেশী দুঃসাহসী হ'য়ে উঠেছে। Rule Britannia rules the wave! বৃটিশ শক্তির নৌবাহিনীকে তাচ্ছিল্য করার দুঃসাহসও জাপানীর আজকাল হ'য়েছে।...

আশ্চর্য সাহস, আর ঔদ্ধত্য!

'প্রিন্স্ অফ ওয়েলসের' মতন উত্তেজনা নিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে 'রিপালস্' খানিকটা দূরে।

অয়ারলেস্ অপারেটার সংবাদ পা'চ্ছেন। আটশো কিলোমিটার সাতশো...ছ'শো...!

অনেক জোড়া চোখ দূরবীণ এঁটে আকাশের দিকে তাকিয়ে। খান কয়েক 'ফাইটার' ততক্ষণে আকাশে উঠেছে—তাদের গর্জন কাঁপছে বাতাসে।

তিনশো-দুশো-একশো—এক ঝাঁক জাপানী প্লেন মাথার ওপর এসে প'ড়লো।

প্রথমে কোণ ঘেঁসে ওরা আক্রমণ স্থরু ক'রলো। মিনিটে যে কতোগুলো বোমা প'ড়ছে—তা বোঝবার কোন উপায় নেই।... প্রথম কিছুটা সময় হাই বম্বিংয়ের দরুণ অধিকাংশ বোমাই লক্ষ্যচ্যুত হ'য়ে সমুদ্রের জলে প'ড়লো।

ধীরে ধীরে ওরা নেমে এলো, আর ছড়িয়ে প'ড়লো। বিব্রত হ'য়ে উঠলো নৌ-সেনারা। চারদিক ঘিরে এমন তীব্র আক্রমণের কল্পনাও ওরা করে নি।

ক্রমশঃ পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হ'য়ে উঠলো যখন উভয় পক্ষ কেউ আর বিচলিত নয়—স্থির-দৃঢ়।

নির্বিবাদে জাপানী বিমান থেকে বোমা পড়ে প্রিন্স-অফ্ ওয়েলসের বুকে। ষোলো ইঞ্চি পুরু ইস্পাতেও বুঝি এবার আগুন জ্বলে উঠবে!

আকাশের বুকে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। এ্যান্টি এয়ারক্রাফ্টের গোলাকে এড়াতে পারছে না জাপানী বিমান। মিনিটে মিনিটে ঘায়েল হয় —দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে আগুন। পাক খেতে খেতে ছিটকে পড়ে সমুদ্রের জলে—!

ফাইটারগুলো ক্ষুধার্ত চিলের মতন ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে—শত্রু বিমানের আবর্তে।

শেষ পর্যন্ত জাপানী বিমান-আক্রমণের অধিনায়ক সচকিত হ'য়ে

উঠলেন। চারশ ফিট নিচুতে তাঁর প্লেন খানাকে একবার নামিয়ে এনে পরিস্থিতি উপলব্ধি ক'রলেন। অনেকগুলো বিমান নষ্ট হ'য়েছে। এখনও পর্যন্ত 'প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলসের' কোনো ক্ষতি হয় নি।...প্লেন নিয়ে আবার ওপরে উঠে গেলেন। কিছু পরে আরো তিন জোড়া প্লেন তাঁরই মতন ওপরে উঠে গেলো।...অকস্মাৎ জাপানী বিমানের আক্রমণ এক কোণে প্রবল হ'য়ে উঠলো। নৌ-বহিনী সে দিক বাঁচাতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।..ইতিমধ্যে উল্কার মতন ওপর থেকে দু'টো প্লেন—'প্রিন্স্ অফ ওয়েলসের' বিরাট চিমনির মধ্যে ঢুকে গেলো।

এডমিরাল ফিলিপ আঁৎকে উঠলেন।···মাত্র কতকগুলো মুহূর্ত, 'প্রিন্স অফ ওয়েলেস্" ভীষণ শব্দে কেঁপে উঠলো। দেড়শো ফুট শূন্যে ছিটকে পড়লো তার চিমনি,—জাহাজের ইঞ্জিন ঘর টুকরো টুকরো হ'য়ে গেলো।···এই ফাঁকে দশ পনরো খানা প্লেন মরিয়া হ'য়ে নেমে এলো জাহাজের বুকের ওপর—যেখানে যতটুকু সুবিধে পেলো বোমা ছড়িয়ে উড়ে গেলো আকাশে।

'রিপালস্' এর অনেক আগেই ঘায়েল হ'য়ে গেছে।

বৃটিশ নৌ-বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' আর 'রিপালস্কে' পাঠিয়েছিলো। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' যে দিন সিঙ্গাপুরে আসে সে দিন নৌ-বাহিনীতে উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিলো।···সেই অপরাজেয় প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলসও শেষ পর্যন্ত জাপানী আক্রমণে বিধ্বস্ত হ'লো—! ব্রিটানিয়ার কী দুর্ভাগ্য!

এরপর জাপানী সৈন্যকে বাধা দেবার মতন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। মালয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে জাপানী সৈন্য দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগলো। এ সময় ভারতীয় যোদ্ধারা যে অপূর্ব সাহস ও বিক্রমের সঙ্গে

জাপানীদের বাধা দেবার চেষ্টা ক'রেছিলো তা সত্যই অতুলনীয়। 'প্রিন্স্ অব্ ওয়েলসের' মতন জাহাজ জাপানী আক্রমণে যদি টিঁকে থাকতে না পারে, তবে অর্ধসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনী যে কী ক'রে জাপানের মতন দুর্ধর্ষ সৈন্য এবং রণপণ্ডিতদের বাধা দেবে—তা কেউ ভেবে উঠতে পারলো না। ভারতীয় সৈন্যরা তো অথর্ব—। ঠিক এমন ধরণের মনোবৃত্তি পোষণ ক'রতেন অধিকাংশ ব্রিটীশ রণ-পণ্ডিতরা। তাই জাপান যখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো, 'প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্' ডুবে গেলে, তখন সমস্ত ব্রিটিশ সেনা মহলে নিরাশার ছাপ লাগলো। ইংরাজীতে যাকে ব'লে 'Morale break', ঠিক তাই হ'লো। ভারতীয় সৈন্যদের একেবারেই যে তা হয় নি তা নয়। তবে সেটা অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের ভয়ের মতন। ভারতীয় সৈন্যেরা কতটুকুই বা জানতো যে তাদের ভয় হবে— ?

তবু এই ভারতীয় সৈন্যরাই প্রাণপণে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে, হাজারে হাজারে মরেছে, শত্রু মেরেছে। সৈন্যদের সময় মতন Reinforcement বা সাহায্য পাঠানো হয় নি। এমন কি, এদের উপযুক্ত বিমান বা নৌ-সাহায্যও দেওয়া হয় নি। তার ফলে ভারতীয় সৈন্যের কতকগুলি, যেমন—২/২, ২/৩, ৩/৯ গুর্খা রেজিমেণ্ট একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়! পৃথিবীর এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কেউ কি তাদের নাম মনে রাখবে ?

ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যে জাপান সিঙ্গাপুরে এসে পড়লো। ৩১শে জানুয়ারী তারিখে প্রকৃতপক্ষে মালয়ের যুদ্ধ শেষ হলো, আর সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ সুরু হ'লো।

এখানে পূর্বরণাঙ্গনের ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসের একটা উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ পঞ্জী দিলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে—

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪১—'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্' যুদ্ধ জাহাজ আক্রান্ত, বিধ্বস্ত এবং জলমগ্ন হ'লো।

১৩ই ডিসেম্বর—জাপানীরা "গুয়াম" দ্বীপ অধিকার করে।

১৪ই ডিসেম্বর—থাইল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাপানী সৈন্য বর্মার পয়েণ্ট ভিক্টোরিয়ার সীমায় হাজির হয়। হংকং আক্রমণ।

২৪শে ডিসেম্বর—ওয়েক আইল্যাণ্ড জাপানীদের অধিকারভুক্ত হ'লো।

২৫শে ডিসেম্বর—হংকং আত্মসমর্পণ করে।

২৭শে ডিসেম্বর—জাপানী বিমান Open city 'ম্যানিলায়' বোমা ফেলে।

১১ই জানুয়ারী—'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে' জাপানী সৈন্যের অবতরণ।

২৩ শে জানুয়ারী—'সলোমন' দ্বীপে শত্রুপক্ষের অবতরণ।

৩১ শে জানুয়ারী—মালয়ের যুদ্ধ শেষ এবং সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ আরম্ভ।

(২)

৬ই ফেব্রুয়ারী…

আমরা সিঙ্গাপুরে এসেছি। যেখানে র'য়েছি সে জায়গাটার নাম 'চাঙ্গী'।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে রোমাঞ্চ ইতিপূর্বে আমি স্বপ্ন দেখতাম, কল্পনা কোরতাম, বাস্তবে দেখছি সে কল্পনা মোটেই মিলছে না। বিলাতী সিনেমায় যুদ্ধ-ছবি দেখে নিজেকে নায়ক ভেবেছি মনে মনে। আর তাই যতো কিছু অসমসাহসিক কাজ ক'রে অক্ষত হ'য়ে থাকবার ধারণাটাও অজান্তে বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিলো। এখন দেখছি ব্যাপারটা

অতো রঙীন নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে এমন একটা জায়গা, যেখানে সব সময় মানুষকে বাস্তব পৃথিবীর কথাটুকু মনে রাখতে হয়।

কঠিন নিয়ম কানুন আর শাসনের মধ্যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাটছে। কাজের চাপ গেছে অসম্ভব বেড়ে। যে কোনো সময়ে যে কোন প্রয়োজনে ডাক আসে। ছুটে গিয়ে স্যালুট ক'রে দাঁড়াতে হয় আদেশের প্রতীক্ষায়। সে সময় যদি আদেশ হয় হামাগুড়ি দিয়ে তিন মাইল জঙ্গলের গোপন রাস্তাটা দিয়ে অমুক জায়গার খবরটা জেনে এসো—আমি ব'লতে পারবো না যে ওটা আমার কাজ নয়—আমি store clerk, আমার কাজ store-এ! যে কোনো প্রয়োজনে যে আদেশ করা হ'বে আমরা তা ক'রতে বাধ্য।

এদিকে দিনে এবং রাত্রে দুবেলা যখন তখন সাইরেন্ বাজছে। ষাট, সত্তর খানা ক'রে জাপানী প্লেন্ দল বেঁধে উড়ে এসে বোমা ফেলে। এক ঝাঁক ক'রে আসে, আর চ'লে যায়; আবার এক ঝাঁক হাজির হয়। কিছু নষ্ট হয়, কতকগুলোয় আগুন লাগে। এসব নষ্ট হওয়াটা অবশ্য কিছুই নয়--কারণ যুদ্ধ 'অহিংস সংগ্রাম' নয়।...

প্রথম প্রথম যখন সাইরেন শুনতাম তখন ভীষণ ভয় হ'তো। কারণ আমরা সামরিক এলাকার লোক। বিমান আক্রমণ প্রধানতঃ সামরিক এলাকায় সীমাবদ্ধ, শত্রুপক্ষের সামরিক ক্ষতি করাই যুদ্ধরীতি। তাই যখনই সাইরেন্ বাজে আমরা জানি শীঘ্র জাপানী প্লেনের বোমা-বৃষ্টির তলায় খানিকক্ষণ আমাদের থাকতে হ'বে। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারি। আর বাস্তবিক পক্ষে 'মরণকে শ্যাম সমান' ভাববার উদারতা আমাদের নেই। আমাদের সঙ্গে একটি মাদ্রাজী ছেলে আছে, যাকে আমরা ইয়ার্কি ক'রে ডাকি 'রবিন্সন্ ক্রুসো'। 'রবিনসন ক্রুসো' প্রায়ই বলে—জীবনটা তার কাছে Sport, যুদ্ধে সে এসেছে

কেবল এই Sport এর লোভে। কোন কিছুর সম্বন্ধেই তার সংস্কার নেই। মৃত্যু ভয়টা নাকি সংস্কার। এ হেন কঠিন সংস্কারহীন 'রবিনসন ক্রুসো'-কেও দেখ্‌ছি সাইরেন্‌ বাজলেই তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে আশ্রয়স্থলে পড়িমরি করে ছোটে।

৭ই ফেব্রুয়ারী...

চাঙ্গীর সামরিক হাসপাতাল—১২নং ইণ্ডিয়ান জেনারেল হস্‌পিটাল—আজ জাপানী বিমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে। প্রায় দেড় হাজার ভারতীয় সৈনিক এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো। যে রকম ভাবে জাপানীরা এই হাসপাতালটা নষ্ট করেছে, তাতে সন্দেহ হয়, হতাহতের সংখ্যা খুব বেশিই হবে।

হাসপাতালের ওপর বোমা ফেলা যুদ্ধনীতি নয়। জাপান সে নীতি লঙ্ঘন করেছে। আশ্চর্য, মানুষ এত পৈশাচিক হয় কি করে?

হাসপাতালে আমার এক বন্ধু ছিলো। তার কোনো খবর পাচ্ছি না। সে বোধ হয় আর বেঁচে নেই!

বড় বিশ্রী লাগ্‌ছে আজকের দিন। বার বার মনে হচ্ছে ওই হাসপাতালটার কথা। শক্তি সামর্থ্যহীন, দুর্বল, রোগগ্রস্ত, আহত কতকগুলো সেনা ছিলো সেখানে—আর কী ছিলো যেগুলোকে বোমা-বিধ্বস্ত না করলে যুদ্ধজয়ের অগ্রগতিতে বাধা ঘটাচ্ছিলো? কে জানে—কোন্‌ মনুষ্যত্ব অক্ষম পঙ্গু-প্রাণকে এমন ক'রে হত্যা করার প্রেরণা জোগায়। জীবনের মূল্য যারা স্বীকার ক'রে না, তারা আর যাই হোক, মানুষ নয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এটা unfair. হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা—যুদ্ধের গোড়ার কথা যাই হোক না কেনো—মুমূর্ষু কতকগুলো মানুষকে তাদের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে এমন ক'রে হত্যা করা মোটেই মনুষ্যজনোচিত গুণ নয়।

৯ই ফেব্রুয়ারী :

ভয়, ভাবনা, কাজ আর বোমা বৃষ্টির মধ্যে কটা দিন কেটে গেলো। যুদ্ধের আসল খবর চাপা দেবার জন্যে কর্তৃপক্ষ যতোই চেষ্টা করুন না কেনো—আমরা প্রকৃত খবরটা নানাভাবে আন্দাজ করতুম। বিশেষতঃ জাপানী বিমান বোমা-বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে propaganda leaflets (প্রচার পত্র) ছড়িয়ে যেতো তা থেকে অনেক নতুন খবর জানা যেতো।

সম্প্রতি ক'দিনের নানারকম ঘটনার মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছিলুম যে, আর বেশি দিন আমাদের এমন ভাবে থাকতে হবে না। হয় জাপানী বোমায় স্বর্গলাভ করবো, না হয় তাদের হাতে পড়বো; স্পষ্টই বুঝতে পারতুম চাঙ্গী জাপানীদের হাতে যে কোনো মুহূর্তে চলে যাবে। এ সময় নানা গুজব কানে আসতো। জাপানীরা ভারতীয়দের কোনো ক্ষতি করছে না এ সংবাদটাও আমাদের জানা ছিলো। আমি কিন্তু এ সব গুজবে মোটেই বিশ্বাস ক'রতাম না। হাসপাতালের ওপর বোমা ফেলে যারা অসহায় রুগীদের হত্যা করতে পারে, তারা যুদ্ধটাকে বাস্তব স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবেই নিয়েছে। সেখানে দয়া, মায়া, নীতি, উদারতা, মনুষ্যজনোচিত এ সব গুণের কোনো স্থান নেই। পরে জেনেছি—মিত্রপক্ষ হাসপাতালের সীমার মধ্যে কতকগুলি মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলো। জাপানীরা সতর্ক করা সত্ত্বেও তাতে মিত্রপক্ষ কর্ণপাত করেন নি।

এখানে ক'দিন আমাদের অত্যন্ত শক্ত 'ফেটিগ' নিতে হ'লো। ফেটিগ কথার অর্থ এই যে, যদিও আমরা clerk, তবু আমাদের অন্যান্য নানা কাজ ক'রতে হ'য়েছিলো। ফেটিগ নেবার সময় একজন উচ্চ-পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী একটা কথা বলে। কী জানি কেনো, অতি বিনীত

ও নরম স্বরে তার সেই কথা বলাটা আমার খুব ভালো লেগেছে। প্রায়ই সে কথাটা মনে প'ড়ে। কথাটা হচ্ছে—"Will you not help us in these hard days?" ভেবে দেখেছি সাধারণ ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মনোবৃত্তিতে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অগোচরে কাজ ক'রে যাচ্ছিলো এ হ'চ্ছে তারই একটা প্রকাশ। তবে সে প্রকাশটা বিপদের মুখে পরিবর্তিত হ'য়েছে। প্রভুর হুমকি নেই, অনুরোধ আছে।

একটা জিনিস এই যুদ্ধক্ষেত্র এসে উপলব্ধি ক'রতে পারলুম। মানুষ আবেষ্টনীর দাস। যে আবেষ্টনীর মধ্যে সে থাকে সেই আবেষ্টনীর মধ্যে তার নিজস্ব স্বার্থটুকু রক্ষার জন্যে সে সব সময়েই সচেষ্ট।

১৮:ই ফেব্রুয়ারী ঃ

আমরা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছি। ৮ই ফেব্রুয়ারী শেষ রাত্রে জাপানী সৈন্য চাঙ্গীতে অবতরণ করে। অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে প্রায় চারঘণ্টা আমরা পাথরের মতন ব'সেছিলাম। তাঁবুর মাথার ওপর দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক একাদিক্রমে এরোপ্লেনগুলি অতিক্রম ক'রতে থাকে।

ভোরের দিকে অন্ধকার তখনো কাটেনি, আমরা পশ্চাদপসরণ ক'রতে আরম্ভ করলুম।

অনেকটা পিছু হটে এলাম। বেশ বেলা হ'য়েছে, এমন সময় একটা গ্রামে এসে পৌছোলাম। ফাঁকা গ্রাম—বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত; বুঝলাম প্রাণভয়ে সব পালিয়েছে। আমাদের ভীষণ খিদে পেয়েছিলো। আমি এবং আর তিন চার জন মিলে খাবারের খোঁজে বেরুলাম। খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে একটা বাড়ীর দালানে এসে দাঁড়ালাম! বাড়ীটার কোনো ক্ষতি হয় নি, বোমার আঘাত থেকে অনেক কষ্টে

গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। লোক নেই জানতাম; কিন্তু যদি তাদের সঞ্চিত খাবার কিছু পাওয়া যায়—এই আশায় অন্তঃপুরে পা বাড়ালাম। একটা ঘরে—(যতদূর মনে হ'লো তাদের খাবার ঘর হবে) টেবিলের ওপর গোটা ক'য়েক চীনেমাটির বাটি। বাটির মধ্যে ভাত, পাশে সরু সরু কাঠি। বুঝতে পারলুম চৈনিক রীতিতে এ বাড়ীর বাসিন্দারা ভাত খেতে অভ্যস্ত।···

ঘুরতে ঘুরতে বাড়ীটার পেছোন দিকে এসে দাঁড়ালাম। যা ভেবেছিলাম তা নয়। বাড়ীটা সামনের দিকে অক্ষত থাকলেও পেছোন দিকটা খানিকটা নষ্ট হ'য়েছে। একটা ছোট কুঠরী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত···আর তার চৌকাটের গোড়ায় একটা মৃতদেহ প'ড়ে র'য়েছে। স্প্লিন্টারে তার দেহ কুৎসিৎ ভাবে ক্ষতবিক্ষত। লোকটা চীনে।···· ফিরে এলাম,....খাবার পাওয়া গেলো না। আসবার সময় সেই চীনে বাড়ীটার দালান থেকে কিছু আখ (ইক্ষু) পাওয়া গিয়েছিলো।

১৫ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ আমাদের পশ্চাদপসরণের যখন পালা চ'লেছে, তখন বুলার ক্যাম্পে কিছু চাল ডাল সংগ্রহ ক'রে আমরা তিন চার জন বন্ধু মিলে রান্নার যোগাড় ক'রলাম। বাস্তবিক পক্ষে তখন যদিও খুব কঠিন বিপদের মধ্যে আমরা র'য়েছি, তবু সে বিপদ তেমন ক'রে আর আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত ক'রতে পারতো না। সব যেনো কেমন গা সওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো। জানতাম হয় বোমায় মরবো, না হয় বন্দী হবো। বিপদের মধ্যে এই desperate ভাবটাই আমাদের সাহস আর বুদ্ধি জুগিয়েছে।

রান্না শেষ হ'লো। অনেক দিন পরে বেশ তোয়াজ ক'রে খাবো, এই মতলবে মনের আনন্দে সব খেতে বোসলাম। ঠিক সেই সময় হঠাৎ গোলা বর্ষণ আরম্ভ হ'লো। উঠে পড়লাম। চারপাশ থেকে

গোলা আসছে। বুঝতে পারলাম জাপানী শত্রু চার পাশ থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। পালাবার উপায় নেই।...আমরা কোনো রকমে সেই গোলার ব্যূহ থেকে বেরিয়ে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। রাত্রে সেই ভাঙ্গা বাড়ীর বারান্দায় শুয়ে থাকলাম। সকালে শুনলাম ইংরেজ পক্ষ আত্মসমর্পণ ক'রেছে। আত্মসমর্পণের পর আবার জানতে পারলাম ইংরেজ সৈন্য প্রায় সমস্তই সিঙ্গাপুর থেকে চ'লে গিয়েছে, সামান্য মাত্র আছে। তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম মিত্রশক্তির সৈন্য সমাবেশের তাৎপর্য কী! সবার আগে ভারতীয় সৈন্য, তারপর অষ্ট্রেলিয়ান, এবং সবার শেষে বৃটিশ সৈন্য; সাধারণতঃ এভাবেই সৈন্য সমাবেশ হ'তো।

৯৭ হাজার আত্মসমর্পিত সৈন্যদের মধ্যে ৬০ হাজার ছিলো ভারতীয়, বাদ বাকী অষ্ট্রেলিয়ান, বৃটিশ এবং অন্যান্য সৈন্য মিলিয়ে।

আত্মসমর্পণের সময় মিত্রশক্তির কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল পার্সিভাল্ ভারতীয় সৈন্যদের জন্যে বিশেষ কিছুই করেন নি। তিনি যখন জাপানী অধিনায়ক লেঃ জেনারেল ইমাসিতার সামনে আত্মসমর্পণের সর্তগুলি দস্তখত করেন, তখন তিনি প্রশ্ন করেন—"Will the Imperial Government (of Japan) take care of the British Civilians?"

লেঃ জেনারেল ইমাসিতা বলেন, "Yes! We shall see that. Please sign it."

এর পর ১৬ই ফেব্রুয়ারী একজন ইংরেজ অফিসার আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যদের সিঙ্গাপুরের ফারার পার্ক নামক জায়গায় সমবেত হ'তে বোললেন ও জানালেন যে, তাঁরা আমাদের থেকে পৃথক হ'য়ে যাচ্ছেন।

আমরা পরের দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী ফারার পার্কে (Pharar) জমা হ'তে সুরু কোরলাম।

মার্চ মাসে ঃ

১৭ই ফেব্রুয়ারী আমরা তিন বন্ধুতে একজন স্থানীয় মাদ্রাজী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আহার কোরলাম। ভদ্রলোক অতিথি সৎকারে সামান্য মাত্র ত্রুটি রাখেন নি।···কিছুদিন অর্ধাশন ও অনশনের পর অমন যত্নে খেতে পেয়ে আমরা পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার কোরলাম। তারপর পরম নিশ্চিন্তে একটা ঘুম। যুদ্ধে এ কদিন বাস্তবিক পক্ষে ঘুমোতে পারি নি। সব সময় মাথার ওপর বিপদের মেঘ ভাসছিলো, তার উপর অমানুষিক পরিশ্রম। এখন আর সে সব কিছু নেই। ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমাদের যুদ্ধ শেষ হ'য়ে আত্মসমর্পণ পালা সাঙ্গ হ'য়ে গেছে।

বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত গভীর ঘুমের পর আমরা বাইরে বেড়াতে বেরুলাম। যদিও সিঙ্গাপুরের বুকে তখনও যুদ্ধের তাণ্ডব লীলার ছাপ লেগে র'য়েছে, তবু নরনারীর মধ্যে কোথায় যেনো একটু ক্ষীণ শান্তি এসেছে। তাদের মুখে ম্লান হাসি। চোখে স্বস্তির ছাপ। সিঙ্গাপুরে তখনো জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে; বড় বড় গুদোম ঘর পুড়ছে।

ঘণ্টা দেড়েক ঘোরাঘুরি ক'রে এগিয়ে গেলাম ফারার পার্কের দিকে। পথে জাপানীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিলো। তাদের মধ্যে যারা একটু একটু ইংরেজী জানে তাদের সঙ্গে আমরা আলাপ ক'রছিলাম। আমরা পরস্পরকে অভিবাদন জানাচ্ছিলাম। একটি জাপানী সৈনিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হ'লো। সৈনিকটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আমাদের বন্ধু সম্বোধন ক'রলো।

ক্রমে আমরা মৃত নর ও জীবজন্তুর দেহাকীর্ণ বিধ্বস্ত সহরের রাস্তা দিয়ে ফারার পার্কে এসে পৌঁছোলাম। অনেক ভারতীয় সৈন্য ইতিমধ্যে সেখানে জমায়েৎ হ'য়েছে। ফারার পার্কের দোতালার উপর কিছু অংশ বক্তৃতার মঞ্চরূপে সাজানো হ'য়েছে। মাইক্রো-ফোনেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে ক্যাপ্টেন মোহন সিং, মেজর ফুজীওয়ারা (জাপানী) ও বহু বিশিষ্ট অফিসারেরা উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ অফিসার Lt. Col. Hunt ভারতীয় বাহিনীকে বিনাসর্তে সমর্পণ ক'রলেন; এটুকুও শেষে বললেন যে, এতোদিনে আমরা যেমন ইংরেজকে মান্য ক'রেছি—আজ থেকে যেন জাপানীকে সেইরকম মান্য করি। অর্থাৎ ইংরেজ প্রভুর নিকট আমাদের যে গোলামী সুলভ বাধ্যবাধকতা ছিলো, এবার থেকে যেন সেটা জাপানীর নিকট থাকে। মেজর ফুজীওয়ারা ছিলেন সেখানকার নিপ্পন বাহিনীর প্রতিনিধি। আমাদের সমর্পণ করা হয়েছিলো তাঁর হাতে। তিনি আবার আমাদিগকে ভারতীয় প্রতিনিধি মোহন সিংএর হাতে সমর্পণ ক'রলেন।

(৩)

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সংঘটনের সূত্রপাত

মোহন সিং প্রচার ক'রলেন যে, আমরা ভারতীয় সৈন্যরা শৃঙ্খলিতা, পরপদানতা ভারতমাতার বন্ধন মুক্তির জন্য Indian National Army তৈরী ক'রবো। মেজর ফুজীওয়ারা জাপানীদের তরফ থেকে ভারতীয়দের সর্বরকম সাহায্য ক'রবার জন্য প্রতিশ্রুত হ'লেন।

সেই সভায়—

"চল্ চম্‌রে নওজোয়ান
চলো সঙ্গে চলে হাম···
ভারত নে ফুকারায়
মোহন সিং নে ফুকারায়···ইত্যাদি"

এবং আরো কয়েকটি এমন ধরণের গান গাওয়া হয়।

পরের দিন সকালেও অনুরূপ সভা হ'লো। সেই সভায় প্রায় ৪০।৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্য উপস্থিত ছিলো। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সেদিন স্ফূর্তি দেখা যাচ্ছিলো। বেলা দশটা আন্দাজ সভা শেষ হ'লো।

আমরা যারা ৫ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছেছিলাম, তাদের মধ্যে প্রায় দুশো জনকে অন্য এক ইউনিট্ অর্থাৎ "৩৬ ফিল্ড এাম্‌বুলেন্স্" এর সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হ'লো।

ভারতীয় সৈন্যদের বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হ'লো ; যেমন সালিতার, বিদ্যাধরী, করাঞ্জী, নিছুন প্রভৃতি। আমরা প্রথমে নিছুনে, এবং কিছুদিন পরে সালিতার ক্যাম্পে গেলাম।

জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণের পর থেকে জাপানীরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার ক'রছিলো। তারা আমাদের কোনো জিনিস নেয় নি ; খানা তল্লাসীও ক'রেনি। ফলে আমাদের মধ্যে অনেকের কাছে যথেষ্ট টাকা, বহু জিনিসপত্র, এমন কি আগ্নেয় অস্ত্রও থেকে গেলো।

আমার নিজস্ব হ্যাভারস্যাকে ডায়েরীখাতা, কলম, রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', আর খুচরো দু'একটা জিনিস ছিলো। অল্প কিছু টাকা অবশ্য আমারও ছিলো—তবে সে টাকা ছিলো পকেটে।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখি। ডায়েরী লেখাটা বরাবরই অভ্যাস ছিল; বিশেষতঃ প্রাচ্যের রণাঙ্গনের সংস্পর্শে এসে সে লেখার অভ্যাসট খুবই নিয়মিত হয়েছিল। কিন্তু হোলে কি হয়, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে, এক টুকরা লেখা কাগজ সঙ্গে করে আনা কারুর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে যাঁরা অপেক্ষাকৃত দুঃসাহসী আর সুকৌশলী, তাঁরাই কোন প্রকারে কিছু কিছু লেখা-নোট কোন রকমে লুকিয়ে এনেছিলেন। পরে তার উপর স্মৃতি-শক্তির আলোকপাত করে দেশবাসীর কৌতুহল নিবৃত্তির উপাদানে পরিণত করা হয়। নিজেকেও যদি ভুক্তভোগীর পর্যায়ে ফেলা যায়, হয়ত মিছে কথা বলা হবে না। তবে দুঃখ এই যে নিত্যকার প্রত্যেক ব্যাপারটির কথা প্রত্যেক ঘটনাটির খুঁটিনাটি কাহিনী—প্রতিদিন যেগুলি খাতার পাতায় কালির আঁচড়ে এঁকে রেখেছিলাম, তার অধিকাংশই ছেড়ে আসতে হয়েছে। এখন সম্বল তাদের কোন কোন অংশ, আর স্মৃতির উপরে যে রেখা আজোও গভীর হ'য়ে আছে, সে গুলিকে আবার নতুন ক'রে রূপ দেওয়া তবে এটা বেশ মনে লাগে যে, আমাদের ছন্নছাড়া জীবনের ডায়েরীও যদি খাপছাড়া বা অসংগত না হয়, তাহলে চরিত্রের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকে না যেন—কাজেই মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকের ছন্নছাড়া জীবনের ডায়েরীর এই ত্রুটি পাঠক মহল ক্ষমার চোখেই দেখবেন এ ভরসা করি।

মে মাসের শেষে:

অনেকদিন পরে সালিতার ক্যাম্পে ব'সে অনেক রাত্রে আবার ডায়েরী লিখছি।

কেমন ক'রে কী যে হ'য়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না! মাঝে

মাঝে মনে হয় আমরা যেন দম দেওয়া ইঞ্জিন—রেলপথের ওপর ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে। সে রেলপথের শেষ আছে, কী না আছে, তার কোথায় যে ভাঙ্গা চোরা, কিছুই জানি না। কবে কখন কী যে ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। ভবিষ্যতটা এতোই অজ্ঞেয় যে, শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যতের ভাবনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছি।

বাড়ীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কথা। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি; আমাদের সেই কলকাতা, বাড়ীর সামনের চায়ের দোকানটা, যেখানে দিনরাত আড্ডা মারতাম। স্বপ্নে দেখি সেই চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি—ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি কোথায় সেই চায়ের দোকান, আর কোথায় এই সালিতার ক্যাম্প। আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কেমন করে—। আর কি দেখা হ'বে? কে জানে?

সালিতার ক্যাম্পে আমাদের দিন কাটছে একরকম। প্রথম যখন আসি, কিছুদিন খাবারের একটু কষ্ট গেছে। তারপর সাধারণ, মোটামুটি খাবার আমরা পেতাম। তার জন্য কোনো দিন দুঃখ হয় নি। এ সময় আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে রাখতে যে জিনিসটা সব চেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলো, তা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (Indian National Army) গড়ার দুঃসাহসিক স্বপ্ন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য দেশীয় সৈন্যসজ্জা হ'চ্ছে, এ কি কম আশার কথা! আমার যৎসামান্য অভিজ্ঞতায় তো দেখছি, স্বাধীন ও পরাধীন দেশের মানুষদের মধ্যে কতো প্রভেদ। অনেকবার অনেক রকম অবস্থার সম্মুখীন হ'য়েছি, আর লক্ষ্য করেছি, আমরা পরাধীন বলে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধেও অনেকের সন্দেহ আছে। মনে প'ড়ছে মিষ্টার

চৌধুরীর কথা। ভদ্রলোককে কোনদিন দেখবার সুযোগ ঘটেনি—কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে গল্প শুনেছি।

মিঃ চৌধুরী ছিলেন ফ্লাইং অফিসার (Flying officer). তাঁর যথার্থ 'ডেজিগ্‌নেশান' আমার জানা নেই। একদিন অফিসারদের (officers') ক্লাবে পান ভোজন হ'চ্ছে, এমন সময় একজন বৃটিশ অফিসার সুভাষ বাবু সম্বন্ধে অকথ্য একটা গালাগালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চৌধুরী সেই অফিসারের মুখে পাত্রস্থিত পানীয় ছুঁড়ে দেন।

এ রকম ভাবে পানীয় কারুর গায়ে ছুঁড়ে দিলে ও-দেশী অর্থে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করা বোঝায়। বৃটিশ অফিসারটি তো ক্ষেপে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভল্‌বার বের করলেন। মিঃ চৌধুরীও তাঁর রিভল্‌বার বের ক'রে হাতে নিলেন। দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এলেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্যে। কিন্তু তাঁদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করা হ'য়ে উঠলো না। সেই ক্লাব ঘরে ছিলেন উভয়েরই 'সিনিয়র অফিসার'। তিনি বাইরে এসে দু'জনকেই ডাকলেন এবং তিরস্কার ক'রলেন। মি চৌধুরীকে যখন ব'ললেন—"তুমি তোমার সিনিয়র অফিসারের সম্মান রাখতে শেখো নি—।" তার উত্তরে মিঃ চৌধুরী বললেন—"সে বিষয়ে আমার শিক্ষার ত্রুটি নেই। কিন্তু সিনিয়র অফিসারের চেয়ে আমার জাতীয় নেতার সম্মান আগে। আমি সব সময় সেটা সর্বাগ্রে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রবো।…" মিঃ চৌধুরীর গল্পটা শুনেছিলাম চাঙ্গীতে থাকবার সময়। এও শুনেছিলাম—এরোপ্লেন্ ভেঙে প'ড়ে তিনি মারা গিয়েছেন।…

পদে পদে এমন লাঞ্ছনা আর অপমান আমাদের নীরবে সইতে হ'তো, তাই বুঝতাম পরাধীনতার ব্যথা এবং জ্বালা যেমন গভীর তেমনি অসহনীয়।

জাতীয় বাহিনী তৈরী হ'চ্ছে। আমরা হ'বো সেই বাহিনীর সৈন্য। ভারতকে স্বাধীন ক'রবো আমরা—আমরা হ'বো প্রথম স্বাধীন ভারত সন্তান। অদ্ভুত ভালো লাগতো এই সব ভাবনা আর স্বপ্ন। মাঝে মাঝে আমরা জনকয়েক বাঙালী মিলে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ..' গানটা গাইতাম, আর সকলে ভীড় ক'রে দাঁড়াতো। আমাদের সঙ্গে একজন ছেলে ছিলো সে কোথা থেকে যোগাড় করেছিলো একটা 'মাউথ্ অর্গ্যান্!' প্রায় রাত্রে সে এই সুরটা বাজাতো।

আমরা নামে মাত্র যুদ্ধ-বন্দী। আমাদের ক্যাম্পও নামে মাত্র যুদ্ধ-বন্দী-ক্যাম্প। আমরা পাশ নিয়ে ইচ্ছে মতন বাইরে যেতে পারতাম। পাশ না নিলেও কেউ কিছু ব'লতো না। ক্যাম্পের দরজায় যে সব রক্ষী নিয়োজিত হ'য়েছিলো তারা সবই আমাদের দলের। অবশ্য আই. এন. এ-র পক্ষপাতী এমন লোকদেরই সে ভার দেওয়া হ'য়েছিলো।

আই. এন. এ. তৈরী হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের ফেটিগ্ (Fatigue) ক'রতে হ'তো। হাসপাতাল ইউনিটে থাকার জন্য আমার ফেটিগ্ ক'রতে হয় নি। কিন্তু নিজের ইউনিটের সুবেদার বাহাদুর সিং তলোয়ারের কৃপায় অশেষ দুঃখ সইতে হ'য়েছে।

রাসবিহারী বসু ও ক্যাপ্টেন মোহন সিং

এ দিকে আমরা সিঙ্গাপুর পতনের পর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুকে আমাদের মধ্যে পেলাম। জানতে পারলাম তিনিই এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ক'রবেন, আর ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং জাতীয় বাহিনীর অধিনায়ক হ'বেন। ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং এবং

অন্যান্য আরো অফিসারদের প্রায়ই বক্তৃতা ও জাতীয় বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হচ্ছে শুনতাম। সর্দার পৃতাম সিংকেও বক্তৃতা ক'রতে শুনেছি।

হঠাৎ প্রশ্ন উঠলো কে কে স্বেচ্ছাসেবক হ'বে। আমরা ১৯৪২-এর ২রা মে তারিখে সিঙ্গাপুরের বিদ্যাধরী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত আই. এন. এ. দপ্তর হ'তে একটি সারকুলার পেলাম। তাতে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। তাতে দেখলাম তু'রকম স্বেচ্ছাসেবকের উল্লেখ আছে।

প্রথম স্বেচ্ছা-সেবকদল—অর্থাৎ যাঁরা বিনা সর্তে স্বেচ্ছাসেবক হ'তে রাজী হ'লেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন করবার জন্য তাঁরা সর্বরকম বিপদের সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল—ভারতবর্ষ স্বাধীন ক'রবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হ'বেন, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের অনুমোদন আবশ্যক। আর ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ক'রবেন না।

আমরা প্রথম দলের হ'য়ে যোগ দিলাম, কেননা আমরা জানতাম অহিংস কংগ্রেস্ আমাদের ডাক্‌বে না। অথচো ভারত স্বাধীন করবার এমন স্বর্ণ সুযোগ ছাড়তে আমরা মোটেই রাজী নই। দেশ স্বাধীন করবার জন্য বাইরের সাহায্য নিয়েছেন এমন অনেক দেশের তো নজির রয়েছে ইতিহাসে। তাছাড়া আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি ভারতের বিপ্লবপন্থী অক্লান্তকর্মী প্রবীণ নেতা রাসবিহারী বসুকে। দ্বিতীয়তঃ—১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মে বার্লিন বেতার-কেন্দ্র থেকে আমাদের বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত কণ্ঠ শুনলাম—"The power that could not prevent me from getting out of

India can not prevent me from getting in," অর্থাৎ "যে শক্তি আমার ভারতের বাইরে আসার পথ বন্ধ করতে পারে নি, সে শক্তি আমার ভারত-প্রবেশের পথও বন্ধ ক'রতে পারবে না।"......

স্পষ্টই আমাদের ধারণা জন্মেছিলো উপযুক্ত নেতা ও সাহায্য পেলে জাতীয় বাহিনী দুর্দম বাহিনী হ'য়ে দাঁড়াবে। আমরা হবো স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত সৈনিক। অর্থের লিপ্সা আর পররাজ্যজয় বা লুণ্ঠনের লোভ কোন দিন আমাদিগকে কলুষিত ক'র্ব্বে না—ভারতের স্বাধীনতাই হবে আমাদের একমাত্র ব্রত, আর একমাত্র সাধনা। সৈনিকের—বুকে থাকবে বল, মনে থাকবে সাহস, হৃদয়ে বিরাজ করবেন ভগবান। কে পারবে আমাদের গতি রোধ করতে? আমাদের আদর্শই হবে আমাদের রক্ষা কবচ।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। ভারত স্বাধীন হ'য়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা দিয়েছি প্রাণ। লাল হ'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগরের সূর্যও বুঝি লালে লাল হ'লো। তাই হোক, হে ঈশ্বর, তাই হোক! ভারতের বুকে আবার জেগে উঠুক সেই সূর্য—যে সূর্য আমাদের রক্তে আর আদর্শে আরো লাল হ'য়ে উঠবে, আর তার কিরণে উদ্ভাসিত করে দেবে ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অন্তর স্বাধীনতার মন্ত্রে।

আমরা হ'য়তো থাকবো না—লক্ষ লক্ষ মরবো। কিন্তু ভারতের বুকে থাকবে আরো কতো লক্ষ লোক। তারা যেন সে সূর্যের দিকে চেয়ে প্রণাম ক'রে ব'লতে পারে আমরা স্বাধীন—আমরা মুক্ত...

"দিন আগত ওই
ভারত তবু কই?"

হে কবি, ভারত আর লুকিয়ে থাকবে না. অধোবদন হ'য়ে অদৃশ্য থাকবে না, সকলের আসনের পাশে সেও ঠাঁই নেবে। 'বন্দেমাতরম্'…।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর পরিকল্পনা ও সংগঠন

পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ সংঘবদ্ধ হবার অনেক আগে থেকেই এ সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা হচ্ছিলো বোঝা যায়। সুভাষবাবু বুঝেছিলেন অহিংস রীতিতে স্বাধীনতা বিংশ শতকে আনা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা আনতে হ'লে রক্তপাত অনিবার্য। এ সম্বন্ধে বোধ করি তিনি গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনা ক'রতে থাকেন।

১৯৩১ সালে তিনি ডাক্তারদের পরামর্শ মত ইউরোপের 'ভিয়েনা' সহরে চিকিৎসার জন্যে যান। অবশ্য তখন তিনি ভারত সরকারের বন্দী। নেহাতই চিকিৎসকদের অভিমত, আর তা ছাড়া সুভাষবাবু ভারতের বাইরে গিয়ে থাকলে সেটা সরকারের ভারত রক্ষার পক্ষে শুভ এই বিবেচনায় ভারত সরকার আপত্তি করেন নি। সুভাষবাবু ইউরোপে গিয়ে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রতে ভুললেন না। ফ্রান্স্, ইটালী, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড্ প্রভৃতি সব জায়গায় তিনি ভ্রমণ করবার অজুহাতে ভারতবর্ষের প্রচারকার্য ক'রতে থাকেন। ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের আসল রূপটা তিনি প্রকাশ করলেন। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পায়ের তলায় আটত্রিশ কোটি নরনারী যে উৎপীড়ন সহ্য ক'রছে সুভাষবাবু তার পরিচয় জানালেন। এ সময় তিনি হের হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আভাষ দেন। তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে তিনি বলেছিলেন—যেখানে জার্মানীর

নতূন সরকার কোনো রকম মীমাংসার পক্ষপাতী নয়, আর জার্মানীর বিপক্ষশক্তি কোনো দিন তার দাবী পূরণ করবে না, সেখানে যুদ্ধ বিনা জার্মানীর রাজনৈতিক মীমাংসার শেষ হ'তে পারে না। ... হিটলার তখন সুভাষবাবুর এ মতকে সমর্থন ক'রতে পারেন নি। সুভাষবাবু জানিয়েছিলেন যদি হিটলার তাঁকে যুদ্ধের আরম্ভ সম্বন্ধে একটু আভাষ দেন, তা হ'লে ভারতবর্ষকে তিনি প্রস্তুত ক'রতে পারেন। কেননা ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় যদি কোনো প্রবল শত্রুদ্বারা আক্রান্ত না হয়, তা হ'লে ভারতে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়। শাসক সম্প্রদায়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই বিপ্লব আনা সম্ভব।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হের হিটলার এ মত সমর্থন করেন নি। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন হের হিটলারের সঙ্গে সুভাষবাবুর আবার সাক্ষাৎ হয়, তখন হিটলার তাঁর কথার যথার্থতা উপলব্ধি ক'রতে পারেন, এবং সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী ফ'লে যাওয়ায় তাঁর দূরদর্শিতার জন্য তাঁকে অকপটে সম্মান দান করেন।

অন্যদিকে আমরা সুভাষবাবুর কাছ থেকে জানতে পারি যে, ১৯৩৩ সালে তাঁর সঙ্গে নিপ্পন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী নেতা দেশপ্রাণ রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান হ'তে আরম্ভ হয়।

ইউরোপ এবং নিপ্পন ঘটিত এ সব ব্যাপার থেকে আমাদের ধারণা হয় যে, ভারতীয় জাতীয় বিপ্লব-বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা সুভাষ-বাবুর মনে অনেক আগে থেকেই ছিলো, তিনি কেবল সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন।

সুদীর্ঘ একযুগ পরে সুভাষবাবুর কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হ'লো।

(৪)

২৪শে জুন ঃ

ক্ষীণ স্রোতস্বতীর গ্রীষ্মশুষ্ক বুকে আসে ভরা ভাদরের বন্যা। তার কূল যায় ডুবে—; সে হ'য়ে ওঠে চপল, চঞ্চল, উচ্ছল। বোঝা যায় তার জীবনে আবার এসেছে নতুনের জোয়ার। আমাদের মধ্যেও তেমনি এসেছে নতুনের জোয়ার, প'ড়েছে সাড়া।

'তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে কেমন ক'রে সইবে…!' হে আমার মাতৃভূমি, স্বাধীনতাই তোমার শঙ্খ, তোমার আত্মঘোষণার মাঙ্গলিক, সেই স্বাধীনতা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত।

স্বাধীনতা—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা, ফিরিয়ে আনবো আমরা…—লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো।

ব্যাঙ্কক্ অধিবেশন গতকাল ২৩শে জুন হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগ সরকারি ভাবে ঘোষিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ, চোখে মুখে দৃঢ় শপথের প্রতিচ্ছবি। 'বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু জিন্দাবাদ'।

ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগের ইতিহাস শুনলাম—

জাপান প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে বৃটিশ শক্তির পরাজয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা নতুন সুযোগ দেখলেন।

মেজর ফুজিয়ারা ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের ক্যাপ্টেন্ মোহন সিংয়ের হাতে সমর্পণ ক'রে জানিয়েছিলেন—জাপান পূর্ব এশিয়ার সমস্ত জাতি-গুলির স্বাধীনতার পক্ষপাতী। পূর্ব এশিয়াকে নিরাপদ রাখতে হ'লে

ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জাপান সরকার ভারতকে স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বরকম সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত।

ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং জাপানীদের এই সহায়তার সুযোগ নিয়ে চাইলেন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন ক'রে ভারত স্বাধীন ক'রতে।

এর পর প্রায় তিন হপ্তা পরে ৯ই ও ১০ই মার্চ মালয়ের বিভিন্নস্থান থেকে ভারতীয়রা সিঙ্গাপুরে মিলিত হ'য়ে জাপানীদের এই সহযোগিতার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেন। রাসবিহারী বসু এ সমস্ত সংবাদ রাখছিলেন। তিনি প্রস্তাব পাঠালেন যে, টোকিওতে ভারতীয়দের মিলিত হ'য়ে এ সম্বন্ধে একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই ভালো।

সিঙ্গাপুর সম্মেলন সেই প্রস্তাব সমর্থন ক'রলেন। ফলে ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত টোকিওতে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ভারতীয়দের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে স্থির হ'লো যে, পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠন করা হোক। সংগ্রামের জন্য গঠন করা হোক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। এ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো বিদেশী শক্তির প্রভাব থাকবে না।

সম্মেলনে আরো স্থির হ'লো যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে আরো অধিকতর প্রতিনিধি মূলক ভারতীয় সম্মেলন আহ্বান ক'রে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হ'বে স্বাধীনতা।

ব্যাঙ্ককে এই সম্মেলন হবে তাও স্থির হ'য়ে গেলো।

সমস্ত এপ্রিল আর মে মাস ধরে ব্যাঙ্ককে সম্মেলনের কাজ চ'ললো। অদ্ভুত উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা গেলো পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে।

দেখ্তে দেখ্তে দিন এগিয়ে এলো।

১৯৪২ সালের ১৫ই জুন শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের ভারতবাসীদের ভেতর থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এক অধিবেশন হয়। রাসবিহারী বসু ঐ সভার সভাপতিত্ব করেন, এবং ঐ সভায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কথা সরকারি ভাবে ঘোষিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন রাসবিহারী বসু। 'কাউন্সিল অফ্ অ্যাক্শান'ও ঐ সভায় গঠিত হয়। সমিতিতে ছিলেন পাঁচ জন।

রাসবিহারী বসু—সভাপতি

ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং—সামরিক সদস্য

লেঃ কঃ গীল—সামরিক সদস্য

মিঃ এন্. রাঘবান বার-এট-ল; মিঃ কে পি. মেনন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। ভারতের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সম্মিলিত ক'রে স্বাধীনতা সঙ্ঘ স্থাপন ক'রতে হবে।

২। ভারতীয় সৈনিক এবং পূর্ব এশিয়ার নাগরিকদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে জাতীয় বাহিনীর সৃষ্টি ক'রতে হবে।

৩। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হবে।

৪। ভারতীয়দের এই আন্দোলন এবং ভারত সম্পর্কে জাপান সরকারের মনোভব স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা ক'রতে হ'বে।

৫। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অধিনায়ক হবেন ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং। এই জাতীয় বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস, যেমন—অস্ত্র শস্ত্র, খাদ্য, অর্থ, জাহাজ, এরোপ্লেন যা প্রয়োজন হ'বে—সবই জাপান সরকারের কাছ থেকে ধার নেওয়া হ'বে। কিন্তু

এই বাহিনী কেবল মাত্র ভারতীয় নেতৃত্বে এবং ভারতীয় স্বার্থে চালিত হ'বে।

এই সময় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিংয়ে একটা বেতার কেন্দ্রও খোলা হয়।

১৫ই জুন থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়;

১৩ই জুলাই—

এখানে আজ ক'দিন বৃষ্টি হয়েছে। সিঙ্গাপুরে ষড়ঋতুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ক্যালেণ্ডারের পাতাতেই সীমাবদ্ধ। বিষুবরেখা থেকে মাত্র ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত হওয়ার দরুণ সারা বছরই কম বেশি গরমই এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়া। সমস্ত বছরে তাপমান যন্ত্রে মাত্র এক আধ ইঞ্চি হ্রাসবৃদ্ধি হয়। সে জন্য গরীবরা মাত্র এক ফালি কাপড় জড়িয়েই লজ্জা নিবারণ করতে অভ্যস্ত। আর ইউরোপীয় কেতাদুরস্ত সভ্য প্রাণীরা জামা কাপড়ের প্রাচুর্যের তলায় অসোয়াস্তি বোধ করলেও আবরণ খাটো ক'রতে পারেন না।

আমাদের ক্যাম্প থেকে কিছুদূরে একটা বিল্। চারপাশে ঘন রবারের জঙ্গল। গাছ ঠেসাঠেসি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা প্রায়ই সেই বিলে বেড়াতে যেতাম। কখনো কখনো বা স্নান ক'রতেও যেতাম। সেই বিল থেকে কিছুটা দূরে একটা ঢিবি ছিলো। কতকগুলো জাপানী 'এ্যান্টী-এয়ারক্রাফ্‌টগান' সেখানে রাখা ছিলো। শুনেছি সেগুলো সবই মিত্রশক্তির। হেরে পিছু হঠবার সময় ফেলে গেছে। তবে জাপানী অধিকারের আগে ওগুলো ওখানে ছিলো না। জাপানীরা এদেশ অধিকার করবার পর শত্রু আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে এ সবের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। 'এ্যান্টী-এয়ারক্রাফ্‌ট' গুলো সবই 'ক্যামোফ্লেজ' অবস্থায় রাখা।

সেদিন বিকেলে ওখানে আমরা গিয়েছিলাম। আমাদের মুসলমান বন্ধু সারওয়ারের এই বিলটা দেখবার পর থেকে খালি মাছ ধরবার কথা মনে আসতো। গতকাল কোথা থেকে দুটো ছিপ যোগাড় ক'রেছে। অবশ্য ছিপ ঠিক নয়। লম্বা কঞ্চি কেটে সুতো আর বঁড়শী দিয়ে এক নবাবিষ্কৃত অদ্ভুত ছিপ হাতে ক'রে তার সে কী আনন্দ। সকাল থেকে খালি গুঁতো মারছিলো মাছ ধরবার জন্য বেরিয়ে প'ড়তে। সকালে আমাদের অনেক কাজ থাকতো। সৈনিকবৃত্তিতে আলস্যের স্থান নেই ; কর্মক্ষম হ'য়ে প'ড়তে হয়। তাই আমাদের সতেজ থাকবার জন্যে কোনো না কোনো কাজ করতেই হ'তো। যদিও ক্যাপ্টেন মোহন সিং মাত্র জুন মাসে সরকারি ভাবে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হ'য়েছেন—তথাপি একথা ঠিক জাপানীরা আমাদের তাঁর কাছে সমর্পণ করার পর থেকে তিনিই আমাদের সব ব্যবস্থা করছেন। এ বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।···আমাদের ক্যাম্পের সর্বরকম কাজ আমরা নিজেরাই করি।

দুপুর নাগাদ আমরা মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। বিলে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন প্রায় বিকেল। সারওয়ার তো এসেই লেগে পড়লো মাছ ধরার কাজে। আর দুজন তাকে ঘিরে বসলো। আমি একটু দূরে বসে মাছধরা দেখছিলাম।

অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ক্লান্ত হ'য়ে উঠলাম। ওরা তখনো পর্যন্ত একটাও মাছ ধরতে পারে নি। নানারকম শব্দ ক'রছে, আর জায়গা বদলে বদলে ছিপ ফেলছে। আমি শেষ পর্যন্ত, উঠে দাঁড়িয়ে বিলটার চারপাশে বেড়াতে লাগলাম। ঘনগাছের ঠেসাঠেসিতে জায়গাটা যেমন ছায়াঘেরা, তেমনি স্যাঁৎসেঁতে, তার ওপর আবার বৃষ্টি হচ্ছে কদিন থেক—সব সময় আকাশ মেঘলা।

…হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এলো গোঁ-গোঁ……। আকাশের দিকে তাকালাম, বোধ হয় কোনো জাপানী প্লেন। কোথাও কিছু চোখে পড়লো না।

একটু পরে আবার সেই রকম শব্দ, এবারে খুব কাছে। কি ব্যাপার বুঝতে পারলুম না। বিলের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পূব-কোণে একটা প্লেন্ ঘুরপাক খাচ্ছে।…প্লেন্‌টা যে জাপানী তা শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। আর তা ছাড়া প্লেন্‌টা খুব বেশি উঁচুতে না থাকায় চিনতে পারছিলাম জাপানী প্লেন ব'লে। কিন্তু ওরকম ঘুরপাক খায় কেনো ?

…আমি যখন তাকিয়ে তাকিয়ে এ সব ভাবছি তখন প্লেন্‌টা বিশ্রী বেতালভাবে পাক খেতে খেতে নীচে নেমে এলো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে একটা বিরাট গাছের মাথায় এসে ধাক্কা খেলো। একেবারে মুখ সোজা ক'রে গোঁত্তা খাওয়ার মতন পড়লো।

চোখের পলকে কী যে হ'লো বুঝতে পারলুম না। বিশ্রী একটা শব্দ আর দাউ দাউ ক'রে আগুন উঠলো জ্বলে। চীৎকার ক'রে ডাকলাম ওদের। ওরাও শব্দ শুনে এগুয়ে এসেছে। আমরা দলবদ্ধ হ'য়ে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে। কি কোরতে পারি—? ও আগুন নেভানো কি মুখের কথা ? আমাদের মধ্যে একজন বললো ক্যাম্পে গিয়ে খবর দেওয়াই আমাদের উচিত। তখুনি দু'জনে ছুটে গেলো। আমি আর সারওয়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।

সারওয়ার বললো—লোকটা এমন ভাবে মরলো যে, ওকে সাহায্য ক'রবার কোনো উপায়ই করা গেল না।

আমি বোললাম - প্লেনে কোনো কিছু গণ্ডগোল হ'য়েছিলো বোধ হয়।

সারওয়ার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো—প্লেনের দস্তুরই ওই। একটু কিছু বিগড়েছে কী একেবারে নিঃসহায় হ'য়ে মরা। দেখনা টোকিও সম্মেলনে যাবার পথে ওঁরাও সব কেমন ভাবে মারা গেলেন?

আনমনে প্রশ্ন কোরলাম—কারা?

সারওয়ার বললো—কেন? ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, সরদার পৃতাম সিং, নীলকান্ত আয়ার—খারাপ আব-হাওয়া ছিলো—কী যে হ'লো—প্লেন্‌খানা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেলো।

…চোখের ওপর ভেসে উঠলো এই দৃশ্যটা। কোন গহনারণ্যে কিংবা হয়তো সমুদ্র-বুকে এমনি ক'রে কিছুদিন আগে একটা প্লেন্ ধ্বংস হ'য়ে গেছে! সেই প্লেনে ছিলো চারজন ভারতীয় মহাপ্রাণ নেতা! তাঁদের উপস্থিতি আজকের মতন দুর্দিনে কতো না প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের হিসেব রাখতে ঈশ্বর রাজী নন। তাঁর স্বেচ্ছাচার মানতে আমরা বাধ্য। যেমন ক'রে এতোদিন মেনে এসেছি বৃটিশ প্রভুর স্বেচ্ছাচার।…

….কিছু সময় পরে একটা লরী এসে হাজির। আমাদের সেই দু'জন বন্ধু ও কতকগুলি জাপানী সৈনিক, একজন জাপানী অফিসার ও একজন আমাদের ক্যাম্পের অফিসার।

ওরা সব লরী থেকে নেমে কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। বুঝলো করবার কিছু নেই।

জাপানী সামরিক প্রথায় মৃতদেহকে সম্মান জানিয়ে ওরা আবার লরীতে গিয়ে উঠলো। আমাদেরও ডেকে তুলে নিলো লরীতে।

লরী ছুটে চ'ললো ক্যাম্পের পথে।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাসবিহারী বসু (Council of action) এর নির্দেশ মত আই. এন্. এ. গঠন কার্য আরম্ভ করেন। সিঙ্গাপুরের বিদ্যাধরী ক্যাম্পে আই. এন. এ. হেড্কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসবিহারী বসুর নির্দেশ মতন ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং জি. ও. সি. (জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং) এর কার্যভার গ্রহণ করেন। মোহন সিংয়ের র‍্যাঙ্ক ছিলো জেনারেল। কিন্তু তিনি এই জেনারেল পদ কবে, কি ক'রে পান তা আমাদের জানা ছিলো না। জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণের পর থেকেই তাঁকে আমরা জেনারেল মোহন সিং বলে জানতাম। ঐ সময় মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন লেঃ কঃ (পরে মেজর জেনারেল) শাহ্ নওয়াজ খান। ডিরেক্টর অফ্ মেডিক্যাল সারভিস্ ছিলেন লেঃ কঃ (পরে মেজর জেনারেল) এ. ডি. লোগানাথন। লেঃ কঃ এ. সি. চ্যাটার্জি ছিলেন রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স্ লীগের হেড্ কোয়ার্টারে।

ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্য বাহিনী থেকে স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করে আই. এন্. এ.র বিভিন্ন ইউনিটের গঠন কার্য আরম্ভ হ'লো। তখন মাত্র পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে আই. এন. এ. গঠন কার্যের পরিকল্পনা ছিলো। ঐ সময় অনেকেই স্বেচ্ছায় আই. এন্. এ. তে যোগ দিলেন। যাঁরা যোগ দিলেন না, তাঁরা যুদ্ধ বন্দী হিসেবে থাকলেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আই. এন্. এ. তে কতকগুলো ইউনিট্ তৈরী হ'লো। এস্. এস্. গ্রুপ (পরে বাহাদুর গ্রুপ), ইন্টেলিজেন্স্ গ্রুপ, গান্ধী ব্রিগেড্, আজাদ ব্রিগেড্, নেহেরু ব্রিগেড্, ফিল্ড ফোর্স, মিলিটারী পুলিশ…প্রভৃতি। এস্. এস্. গ্রুপের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কঃ তাজ মহম্মদ খান, ইন্টেলিজেন্স্ গ্রুপের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ

কঃ এস্. এ. মালিক। গান্ধী ব্রিগেডের নাম করণ হ'য়েছিলো মহাত্মা গান্ধীর নাম থেকে, এবং এই ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কঃ এনায়েত কিয়ানী। মৌলানা আজাদ সাহেবের নামানুসারে আজাদ ব্রিগেড্ ও তার অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কঃ গুলজারা সিং। নেহেরু ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কঃ প্রকাশ চাঁদ। প্রত্যেকটি ইউনিটের অধিনায়ক থেকে সুরু ক'রে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সমস্ত ছিলো ভারতীয়। জাপানীদের কোনো রকম হস্তক্ষেপ এ বিষয়ে ছিলো না। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশের আত্মসমর্পণের পর যে সব অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়েছিলো, তাই আই. এন্ এ.-কে দেওয়া হ'লো। পোষাক, পরিচ্ছদ, শয্যা উপরোক্ত রূপেই জাপানীদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিলো। সৈন্যের রসদ সরবরাহ জাপানীরাই ক'রতো। অর্থ ও অন্যান্য জিনিস জাপানীদের কাছ থেকে ধার হিসেবে নেওয়া হ'তো।

সৈন্যদের ভেতর এ সময় ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হ'তো।

এর কিছুদিন পরে মালয়ের কোলালামপুর নামক জায়গায় একটা আই. এন. এ. ট্রেনিং শিবির খোলা হ'লো, তারপরই খোলা হ'লো পেনাঙে ট্রেনিং ক্যাম্প। বেসামরিক ভারতীয় অধিবাসীদের ভর্তি ক'রে ঐ সমস্ত শিক্ষা শিবিরে শিক্ষা দেওয়া সুরু হ'লো।

(৫)

দিন ব'য়ে যায়। মাসের পর মাস আসে, প্রকৃতির লীলায় তা বোঝা যায় না, জানা যায় শুধু ক্যালেণ্ডারের পাতায়। সূর্য ওঠে, আবার ডোবে। জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর…। বিয়াল্লিশ সাল শেষ হ'তে চললো।

আমাদের অনেকের মধ্যে কেমন একটা নিরুৎসাহের ভাব এসেছে। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অবস্থা বিবেচনা ক'রলে উৎসাহ থাকে না। জুন মাসের ব্যাঙ্কক্ অধিবেশন হ'য়ে যাবার পর—আমাদের মধ্যে যে একটা উত্তেজনার ঢেউ এসেছিলো—ক্রমান্বয়ে তিন চার মাস নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকতে থাকতে সে উৎসাহ নিভে যেতে সুরু করলো। জাতীয় বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ যে গঠন হ'চ্ছে এ সংবাদ অবশ্য আমরা জানতাম। কিন্তু কই, আমাদের ডাক আসে কই, ভারতের স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দিবারাত্র আঁকছিলুম তা' সফল করার জন্য যতদিন না প্রকৃত যুদ্ধ কর্ত্তে হচ্ছে ততদিন সোয়াস্তি পাই না। অফিসারেরা আসেন—ক্যাম্পে ক্যাম্পে বক্তৃতা দেন—যুদ্ধ ও ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে নানা রকম সংবাদ জানান। আই. এন. এ. প্রতিষ্ঠার মর্ম্মকথা অক্লান্ত ভাবে বোঝান। সব হয়, কেবল ডাক পড়ে না। আমাদের গঠন কার্যের বাস্তব অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরা তেমন সচেতন ছিলাম না। দু' একজনকে অধৈর্য হ'য়ে ব'লতে শুনেছি—আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন শুধু স্বপ্ন হ'য়েই থাকলো। এ সময় বুঝতে পারছিলুম আদর্শ যতো বড়ই হোক না কেনো—যদি তার সঙ্গে বাস্তব সম্বন্ধ না থাকে—তবে সে আদর্শ কেবল যে দুঃখের বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়, তা নয়—বিরক্তির কারণও হ'য়ে ওঠে।

এমন সময় আমাদের ডাক পড়্লো। ২৭শে অক্টোবর আমাদের নাম I. N. A. তে দাখিল করা হলো। আমি বাহাদুর গ্রুপে যোগ দিলাম। আমাদের ট্রেনিং জোরে চললো।

টুকরো টাকরা যা খবর আসে—তা থেকে সন্দেহ হচ্ছিলো কোথায় যেনো গোলমাল বেধেছে।

কিছুদিন পরে ঘটনাটা আমরা স্পষ্ট ভাবে জানতে পারলুম।

১৪ই নভেম্বর (১৯৪২ সাল) আই. এন. এ. অ্যাডভান্স পার্টি রেঙ্গুনাভিমুখে রওনা হবার কিছু আগে নেতা রাসবিহারী বসু, জেনারেল মোহন সিং প্রভৃতিরা রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা রেঙ্গুনস্থিত আই. এন. এ. অফিসার মেজর ডিলন্ (ইনি বীর গুরুবক সিং ডিলন নন), লেঃ কঃ এন্. এস গিল প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ গোপনীয় বৈঠকে ব'সেন। লেঃ কঃ এন্. এস. গিল এবং মেজর ডিলন্ উভয়েই মোহন সিংয়ের বিশেষ সহকারী ছিলেন।

রাসবিহারী বসু এবং জেনারেল মোহন সিং সিঙ্গাপুরস্থিত হেড্ কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন ক'রলেন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেলো মেজর ডিলন্ রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীতে আবার যোগদান ক'রেছেন। প্রথমে একথা কেউ বিশ্বাস ক'রতে পারে নি। মেজর ডিলনের মতন একজন শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত নেতা যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে এমন ক'রে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন— একথা কেই বা বিশ্বাস ক'রতে পারে ?

অবশেষে সংবাদ সত্য ব'লেই প্রমাণিত হ'লো। মেজর ডিলন্ মিত্র শক্তিতে ফিরে গিয়ে সেখানে আই. এন. এ. সংক্রান্ত সমস্ত কিছু গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে আই. এন. এ. সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এমন কয়েক জন লোক গ্রেপ্তার হ'লেন।

লেফ্টেন্যান্ট কর্ণেল এন্. এস. গিলের চাল চলন সন্দেহজনক দেখে জাপানীরা তাঁকে বন্দী করলো। ব্রহ্মদেশে আই. এন. এ. সংগঠনের এঁরা দুজনই ছিলেন একমাত্র ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা।

সিঙ্গাপুরে এদের গ্রেপ্তার সংবাদ পৌছবার আগেই মোহন সিং জাপানীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাসবিহারী বসু ও Council of

Action-এর বিনা অনুমতিতে আই. এন. এ. অ্যাডভান্স পার্টি রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দিলেন। রাসবিহারী বসু মোহন সিংয়ের কাজে অসন্তুষ্ট হ'য়ে সৈন্যের মুভমেণ্ট বন্ধ করে দিলেন।

এই সব কারণে রাসবিহারী বসু এবং মোহন সিংয়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হ'লো। মোহন সিং জাতীয় বাহিনী ভেঙে দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

মোহন সিং ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে বিদ্যাধরী ও নিসুনের 'রয়েল্ আর্টিলারী বিল্ডিংয়ে' জাতীয় বাহিনীর বিভিন্ন নেতাদের ডেকে মিটিং করলেন। সেই মিটিংয়ে সহকারাদের জানালেন—যে তাঁর বন্দী হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। যদি তিনি বন্দী হ'ন, তাহলে তাঁর সহকারীরা যেন জাতীয় বাহিনী ভেঙ্গে দেয়।

রাসবিহারী বসু, রাঘবন প্রভৃতি নেতাদের ইচ্ছে ছিল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সম্পূর্ণ অধীন থাকে। কিন্তু মোহন সিং চান আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হ'য়ে তাকে স্বেচ্ছামত পরিচালনা ক'রতে।

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে জাপানীরা রাসবিহারী বসুর নির্দেশে মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করলো।

মোহন সিংয়ের গ্রেপ্তারের খবরে চারিদিকে ভীষণ একটা গোলযোগ বেধে উঠলো। মোহন সিংয়ের নির্দেশ মত আজাদ হিন্দ ফৌজকে জানানো হ'লো যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ আর থাকবে না, তা ভেঙে দেওয়া হ'য়েছে। ফৌজের যে সব রেকর্ড পত্র ছিলো তা পুড়িয়ে দেওয়া হ'লো। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো যখন জাতীয় বাহিনীর অধিকারভুক্ত জাতীয় কংগ্রেসের পতাকায় আগুন জালিয়ে দেওয়া হ'লো! হাজার হাজার সৈনিক নির্বাক, বিস্মিত চোখে তাদের

মাতৃভূমির জাতীয় পতাকার এমন পৈশাচিক অবমাননা সহ্য করলো।

আমাদের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল তাজমহম্মদ খান্ আমাদের সাম্‌নে তাঁর নির্দেশ দিলেন। তার মধ্য থেকে আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারিনি যে, আই. এন. এ. সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে কী না। তিনি আমাদের আই. এন. এ. ছেড়ে যাবার যেমন কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ দেন নি—তেমনি তিনিও যে আই. এন. এ. ছেড়ে যাচ্ছেন এমন কোনো কথা উল্লেখ করেন নি।

আমাদের মধ্যে অনেক অবিবেচক অফিসারদের ব'লতে শুনি যে, রাসবিহারী বসু ভালো লোক নন; আমরা আই. এন. এ. তে থাকবো না।

একদিন যখন আমাদের একজন অপেক্ষাকৃত দায়িত্ব পূর্ণ-অফিসার ক্যাপ্টেন খোরাণাকে বলতে শুনলাম—জাপানীরা আমাদের সঙ্গে কোনো অসৎব্যবহার ক'রে নি; আমাদের প্রতি তাদের নীতি অপরিবর্তিতই আছে; কিন্তু রাসবিহারী বসু লোক ভালো নয় তাই আই. এন. এ. ভেঙে দেওয়া হ'লো; তখন আমি আর স্থির থাকতে না পেরে সেই অফিসারকে প্রশ্ন ক'রলাম–'যদি আমাদের প্রতি জাপানীদের কোনো দুরভিসন্ধি না থাকে, তবে আমরা কেন রাসবিহারী বসু, মোহন সিং প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম না চালাই?'...

এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে কেউ পারলেন না। উপরন্তু আমাকে এ কথার জন্য অনেক কটূক্তি শুনতে হ'লো।

আর একজন অফিসার একদা ব'ললেন যে, আই. এন. এ.-র বড় বড় অফিসারদের ভেতর অনেকেই দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আই.

এন. এ-তে যোগ দেন নি ; যোগ দিয়েছেন জাপানীদের বন্দীত্বের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে।

এমন সময় আই. এন. এ. ভেঙে যেতে বসলো। মোহন সিং কয়েকজন স্বার্থান্বেষী অফিসারের চক্রান্তে পড়ে সমগ্র ভারতবাসীর স্বার্থ নষ্ট করতে চেষ্টা ক'রলেন।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা হ'লো যে, জাপানীরা রাসবিহারী বসুকে বিশ্বাস ক'রলেও আই. এন্. এ.-র সমস্ত অফিসারদের বিশ্বাস করতে পারে নি। ফলে জাপানীরা কখনো কখনো আই. এন. এ. অফিসারের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন।

রাসবিহারী বসুর সৎ ও বলিষ্ঠ উদ্দেশ্য থাকা সত্বেও তাঁর বিপক্ষে মোহন সিংয়ের দল প্রচার চালাতে থাকে যে, তিরিশ বৎসর জাপানে থেকে তিনি জাপানী স্বার্থের কথাই বেশি বুঝেছেন—তাঁর সমস্ত কাজ জাপানী স্বার্থকেই পুষ্ট ক'রছে।

সাধারণ সৈনিকেরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনগণের মতনই বুদ্ধিহীন, অশিক্ষিত। তাদের পক্ষে বিচার ক'রে সত্য মিথ্যা বোঝা অসম্ভব। শুধু ভারতবর্ষ কেন, জগতজুড়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ যে জনসাধারণ, ইংরাজীতে যাকে বলে 'মাস্', সে সম্প্রদায়ের বিশেষ গুণই এই যে, যে কোনো সাময়িক ঘটনা বা মতবাদে নির্বিচারে খড় কুটোর মতন ভেসে যাওয়া। অবশ্য যদি সে মতবাদ তাদের মধ্যে একবার প্রচারিত হয়। তাই একদিকে সাধারণ সম্প্রদায় যেমন গরিষ্ঠ সংখ্যক হওয়াতে তার মূল্য আছে, তেমনি অন্যদিকে তাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিহীন সহানুভূতির কোনো মূল্যই নেই। কেননা—আর একটা যে কোনো অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন মতবাদে তারা আবার ভেসে যাবে।

জাতীয় বাহিনীর অবস্থাও তাই হলো। তারা অসন্তুষ্ট বিরক্ত

হ'য়ে উঠলো। অনেকেই ব্যাজ্ ফেরৎ দিয়ে নিজেদের নাম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে কাটিয়ে নিতে চাইলো।

সে দিন আমরা জন পাঁচেক মিলে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে একটি গ্রামে গিয়েছিলাম।

ফেরবার পথে চাঁদ উঠলো আকাশে, একটু কুয়াশাও জড়ানো রয়েছে। মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। আমাদের সঙ্গে একজন জুনিয়ার অফিসার ছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন—মুখ বুজে পথ চ'লতে ভালো লাগে না। এসো একটা গান গাওয়া যাক্।

আমরা যে কয়জন ছিলাম তারা সঙ্গীতশাস্ত্রে এতোই অজ্ঞ যে, মাত্র একখানা গান ছাড়া সম্পূর্ণ দ্বিতীয় কোন গান আর জানতাম না। সেই একখানি গান—যা ইতিমধ্যে শুনতে শুনতে এবং গাইতে গাইতে আমাদের কাছে গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতন হ'য়ে গিয়েছে—সেটাই সমস্বরে সুরু ক'রে দিলাম।

"চল্ চল্‌রে নওজোয়ান
চল সঙ্গে চলে হাম……"

উন্মুক্ত প্রান্তরে আমাদের সমস্বরে গাওয়া সেই গানটি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরতে লাগলো।

গান শেষ হ'লো—এখনো প্রায় দুই মাইল রাস্তা বাকি। গানের মধ্যে একটা লাইন ছিলো (অবশ্য সময়মত সেটা আমাদেরই আবিষ্কৃত)।

"মোহন সিং নে ফুকারায়
ভারত নে ফুকারায়……"

মোহন সিং গ্রেপ্তার হওয়ার পর ওই লাইনটা আমরা বদলে নিয়েছিলাম। যার যে রকম খুসী সে তেমন ভাবেই লাইনটির পাদ-

পূরণ ক'রেছিলো।…মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গানের শেষে বোধ করি সকলের মনেই মোহন সিংয়ের কথাটা মনে পড়ছিলো। তাই একজন যখন বললো—মোহন সিং কোথায়—? তখন সকলকার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। যেনো আমরা ব'লতে চাইলাম 'হতভাগ্য মোহন সিং'!

নিস্তব্ধে খানিকটা পথ পেরিয়ে এলাম। অকস্মাৎ অফিসারটি বললেন—তোমরা মোহন সিংকে দেখেছো?

হ্যাঁ, একবার ফারার পার্কে দেখেছিলাম।

কি রকম মনে হ'য়েছিলো তাঁকে?

তখন আমাদের ভালোই লেগেছিলো—কিন্তু—?

কিন্তু কী?—অফিসারটি প্রশ্ন ক'রলেন।

তাঁর সাম্প্রতিক ব্যবহারে আমরা তাঁর উপর শ্রদ্ধা হারিয়েছি। অত্যধিক ক্ষমতাপ্রীতি তাঁর চরিত্রের একটি মাত্র দোষ, যা তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

অফিসারটি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ব'ললেন—'আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ হ'বার সৌভাগ্য একবার হ'য়েছিলো—'

'আপনি তাঁর কথা তা হ'লে অনেক জানেন?' আমি ব'ললুম।

'কিছু কিছু।'

'বলুন না শুনি।'

অফিসার ব'লতে সুরু ক'রলেন—

মোহন সিংয়ের জন্ম পাঞ্জাবে। ইনি জাতিতে শিখ—খালসা। লেখাপড়া শেষ ক'রে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করেন। কর্মকুশলতার জন্য ক্রমে ভি. সি. ও. (ভাইসরয় অফিসার) এবং পরে আই. সি. ও. (ইণ্ডিয়ান কমিশনড্ অফিসার) হ'ন। যখন

তিনি ব্রিটিশভারতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে মালয়ে আসেন, তখন তাঁর পদটি ছিলো ক্যাপ্টেন্।

জাপানীরা মালয় আক্রমণ করবার কিছুদিন প'রেই তিনি জাপানী সৈন্যের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। সে সময় প্রবাসী ভারতীয় কংগ্রেসকর্মী সরদার পৃতাম সিংয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পৃতাম সিং তাঁকে ভারতীয় স্বাধীনতা ও সংগ্রামের কথা, জাপানীর পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের কারণ বোঝান। তখন থেকেই মোহন সিং আই. এন. এ. গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ক্রমশঃ তিনি জাপানীদের সঙ্গে মিলে আই. এন এ. গঠন ক'রবার প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে জাপানীদের মালয় জয়ে অনেক সুবিধে হয়ে গেল। মোহন সিংয়ের সঙ্গে সে সময় অনেক ভারতীয় অফিসার ও সৈন্য ছিলো।

রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পৃতাম সিংয়ের কি কোনো সম্বন্ধ ছিলো? —আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন ক'রলো।

ঠিক জানি না। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা—সম্বন্ধ ছিলো—অফিসারটি ব'ললেন।

আপনার ব্যক্তিগত মনোভাব কি?—আমি প্রশ্ন করলুম।

কার ওপর, মোহন সিংয়ের ওপর?

হ্যাঁ,

আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আমি করি না। যদিও বাইরে তিনি 'ডিক্টেটারী' ভাব পোষণ ক'রতেন, তবু ভিতরে তাঁর অনেক দুর্বলতা ছিলো। মোহন সিংয়ের জন কয়েক পরামর্শদাতা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে তাঁর চেয়ে উচ্চ পদে (Rank-এ) অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই জাতীয় বাহিনীতে

মোহন সিংয়ের সর্বোচ্চ পদটির জন্য তাঁকে ঈর্ষা ক'রতেন। এই ঈর্ষার বশীভূত হ'য়ে তাঁরা মোহন সিংকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন।

মোহন সিং জাতীয়বাহিনীর সৈন্যদের সংগে অনেক ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার করিতে পারেন নি। অনেকে তাই অসন্তুষ্ট। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কারণে আমাদের জাতীয় বাহিনী ছেড়ে চলে গেছেন।

তবে তাঁর সর্বনাশের একমাত্র কারণ অতিরিক্ত ক্ষমতা-প্রীতি। কিন্তু তা হলেও তিনি মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক ছিলেন। অফিসারটি কথা শেষ করলেন।

আমরা নিস্তব্ধ ভাবে পথ হেঁটে চললাম।

মোহন সিং……হতভাগ্য মোহন সিং…।

রাসবিহারী বসু

সৌভাগ্য বশতঃ সুদীর্ঘ দিন পরে ভারতবর্ষের হয়তো সময় এসেছিলো, সুযোগ এসেছিলো—হ'য়তো সে আবার স্বাধীন হ'তে পারতো; কিন্তু স্বার্থবাদীর চক্রান্তে সে সুযোগ নষ্ট হ'লো। আমাদের চোখের সামনে স্বাধীনতার স্বপ্ন টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেলো।

১৯১২ সাল নয়া দিল্লী হ'য়েছে ভারতের নতুন রাজধানী। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব সমারোহে শোভাযাত্রা করে নয়া রাজধানীতে প্রবেশ ক'রছেন, এমন সময় শোভাযাত্রার মাঝখানে প'ড়লো বোমা —কতক লোক মারা গেলো, হার্ডিঞ্জ সাহেবও এমন 'শক্' পেলেন যে, তা থেকে সারতে তাঁর দেরি হ'ল।

১৯১৩ সাল : কলকাতার রাজাবাজারে বোমার আখড়া আবিষ্কৃত হ'লো।

১৯১৪ সাল : ভারতসরকার দিল্লী বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা সুরু ক'রলেন।

একজন বাঙালী বিপ্লবীর ছবি সর্বত্র প্রচারিত হ'লো ; ১২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'র'লন সরকার।

বিষ্ণুগণেশ পিংলে মীরাটের কেল্লার মধ্যে ধরা পড়লো বোমা সমেত। বিশ্বাসঘাতক 'কপাল সিং' ! বিপ্লবীদের চোখ জ্বলে উঠলো। লাহোর ষড়যন্ত্র—সব ব্যর্থ হ'লো।

১৯১৪ সাল : রবীন্দ্রনাথ জাপান যাচ্ছেন। পি. এন. ঠাকুরও যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়।

কিছুদিন পরে জাপান সরকার খবর পেলেন—যে পি. এন. ঠাকুরকে বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। কে এই পি. এন. ঠাকুর—? আর গোপন থাকলো না রবীন্দ্রনাথের এ আত্মীয়টির নাম। ইনিই বাঙলা তথা ভারতের সেই অদ্বিতীয় বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু ; ১৯১২ সালে নয়াদিল্লীর শোভাযাত্রায় বোমা ফেলা থেকে লাহোর ষড়যন্ত্র পর্যন্ত যিনি ভারতীয় বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব ক'রেছিলেন। জাপানে গিয়েও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর শান্তি নেই। জাপান সরকার তাঁকে বৃটিশ সরকারের কাছে ফেরৎ পাঠাতে রাজী হ'য়েছে। রাসবিহারী বসু জাপানের জনৈক মন্ত্রীকন্যার সাহায্যে আত্মগোপন ক'রে থাকলেন। পরে জাপানী 'ব্ল্যাক্ ড্র্যাগন্ সোসাইটির' চেষ্টায় তিনি সেখানকার নাগরিক অধিকার লাভে সমর্থ হ'লেন।

তারপর সুদীর্ঘ আটাশ বছর কেটে গেলো। সভ্যতার চাকা ঘুরতে

ঘুরতে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলো, যখন পৃথিবীব্যাপী এক মহাযুদ্ধ জ্বলে ওঠা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিলো না।

বৃটিশ বাহিনী পূর্ব এশিয়ায় ক্রমাগত হেরে চ'লেছে। ইউরোপের যুদ্ধেও সে নিষ্পেষ্ট। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তারা পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গন থেকে পিছু হ'ঠেছে। ভারতের অভ্যন্তরেও অসন্তোষের আগুন জ্বল্‌ছে দাউ দাউ ক'রে।

বোমা, ব্লিৎস্‌ক্রিগ, ট্যাঙ্ক, মাইন। বৃটিশ বাহিনী দুর্বল, তারা অক্টোপাশের জালে পড়ার মত চারদিক থেকে জড়িয়ে প'ড়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজডুবির বারুদগন্ধ বুঝি ভেসে এলো নিপ্পনে।...আকাশের নীল তারার দিকে চেয়ে চেয়ে ষাটবৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের চোখেও জল আসে; দীর্ঘ আটাশ বছর তিনি মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হ'য়ে দিন কাটিয়ে চলেছেন। তাঁর পরপদানতা মাতৃভূমি তাঁকে কি তাঁর অকৃতকার্যতার জন্য এই পারিশ্রমিক দিয়েছেন! বড় নিষ্ঠুর এই নির্বাসন। দেশে ফিরে যেতে মন চায়। মন চায় সেই সূর্যতপ্ত আকাশ, উষ্ণ বাতাস, শ্যামল ধানের ক্ষেত, আর লক্ষ লক্ষ অত্যাচার জর্জরিত ভাই বোনের মধ্যে ফিরে যেতে।

অতর্কিতে আসে সুযোগ। ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ক'রতে চায়। মনে আসে সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক মোহন সিং...আজাদ হিন্দ ফৌজ।

আর একবার শেষ চেষ্টা—**either heaven or hell!** বৃদ্ধের চোখে আবার নেমে আসে যৌবনের সেই স্বপ্ন, সাহস ও উদ্যম। কপালের কুঞ্চিত শিরায় দৃঢ় হয়ে ওঠে বিপ্লবীর প্রতিশোধ স্পৃহা। বিপ্লবী রাসবিহারী আবার জেগে ওঠেন।

আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিলো আজাদ হিন্দ ফৌজ, স্বাধীনতা দিন দিন সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠছিলো, নির্বাসিত প্রৌঢ়ের আন্তরিক আপ্রাণ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে। তাঁর ক্লান্তি নেই, শান্তি নেই, এমন কি বয়স-জনোচিত বিরক্তিও নেই।

তাঁর এই দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সার্থক হ'তে হ'তে ভেঙে গেলো। কতক-গুলি স্বার্থান্বেষীর কুটিল আবর্তের মধ্যে তাঁর আদর্শ কলুষিত হ'তে চললো।

১৯৪২এর ডিসেম্বর মাসে মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পরে আই. এন. এ. একরকম ভেঙে যেতে ব'সলো। সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ, অফিসারদের মধ্যে হতাশা...কী দুর্দিন।

টোকিও থেকে ছুটে এলেন সেই দেশপ্রাণ রাসবিহারী বসু। চোখে তাঁর জল। বার বার তিনি উচ্চপদস্থ এবং নিম্নপদস্থ অফিসারদের ডেকে অধিবেশন বসাতে লাগলেন। অনেক যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ!... ফেব্রুয়ারী মাসে 'মালয় স্বাধীনতা সংঘের' শাখায় সংঘ-সভাপতি মিঃ রাঘবনের সভাপতিত্বে এক অধিবেশন হ'য়ে সর্ববাদিসম্মত এক ঘোষণা তাঁর কাছে পাঠানো হ'লো—ভারত সম্পর্কে জাপানের মনোভাবের সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই!

অনেকে প্রশ্ন করলেন—জাপানীরা কেনো আমাদের সাহায্য করতে চায়?—তাদের স্বার্থ কি?

তার উত্তরে 'মেজর জেনারেল ইবাকুরু' বলেন—ভারতবর্ষ ইংরাজাধীনে থাক্‌লে আমাদের বিপদের আশঙ্কা থাক্‌বে। আমাদের সাম্রাজ্যও নিরাপদ থাকবে না। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, জাপানীদের পক্ষে সেটা মঙ্গলজনক। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ জাপানীদের নেই। ভারতের মঙ্গলে জাপানীর মঙ্গল।

এই প্রসঙ্গে তিনি জাপানীদের 'গ্রেটার ইষ্ট-এসিয়া কো-প্রসপারিটি স্ফিয়ারের' (Greater East Asia Co-prosperity Sphere). তাৎপর্যটি এমন যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, মাঞ্চুরিয়াকে চীন সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাঞ্চুকুয়ো নামে তাঁবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে এ পর্যন্ত জাপান যে সমস্ত সংগ্রামমূলক কাজ করে এসেছে— সে সবই যেন চীনের ভাবী কল্যাণের জন্যই !

এর পর এসিয়াবাসীরা ইউরোপীয়দের কাছে কি রকম তাচ্ছিল্যের বস্তু সেটা বোঝানর জন্যে বললেন—১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ উইল্সন ঘোষণা ক'রেছিলেন যে, They were fighting the war for equal footing under the Sun"—অর্থাৎ পৃথিবীতে সকলের সমান অধিকারের জন্যেই তাঁদের এ যুদ্ধ।...জাপান আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের উপরোক্ত ঘোষণায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং তিরিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সম্মিলিত শক্তিকে সাহায্য করেন। কিন্তু যুদ্ধজয়ের পর জাপানী ডেলিগেশনের head, Count Mejubi Versailles Treaty Chamber-এ উপরোক্ত ঘোষণার কথা তুলে তা পাশ করবার দাবী উত্থাপন করেন ; কিন্তু উক্ত সভায় ঐ প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়। তখন জাপান নিজের ভুল বুঝতে পারে।

এখন এশিয়াবাসীকে যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়, তা হলে এশিয়াবাসীদের স্বাধীন হ'তে হ'বে, এবং পরস্পরের সহায়তার মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্মান ও প্রতিপত্তির স্থান ক'রে নিতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা এ কারণেই আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

জেনারেল ইবাকুরুর বক্তৃতার বেশ ফল হ'লো।

...এর পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত গণ্ডগোল মিটে আসতে

লাগলো। ইতিপূর্বে যেমন অনেকে জাতীয় বাহিনী থেকে চলে গিয়েছিলেন—তেমনি এ ঘটনার পরও অনেকে বাহিনীতে যোগদান কর'লেন।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আবার নতুন করে জাতীয় বাহিনী সংগঠনের কাজ পুর্ণোদ্যমে সুরু হ'লো। জাতীয় বাহিনীর গঠনও একটু নতুন রকমের হ'লো। লেঃ কর্ণেল এম. জেড কিয়ানি হ'লেন আর্মি কমাণ্ডার এবং লেঃ কর্ণেল ডোম্‌লে হ'লেন ডিরেক্টর অফ মিলিটারি বুরো।'

এসময় একদিন অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে জানতে পারলাম সুভাষচন্দ্র জার্মানী থেকে পূর্ব এশিয়ায় আসছেন। বিশ্বাস হোল না, কিন্তু তবুও মনে লাগলো বিচিত্র এক উল্লাসের দোলা। একী সম্ভব? সত্যিই কি তিনি আসছেন? কবির কণ্ঠ ঠেলে আসে ভাষা—'বাঙালীর আশা সত্য হোক, সত্য হোক, হে ভগবান'।

মাসের পর মাস চল্‌লো প্রস্তুতি—নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রম সকলের প্রাণে নূতন জাগরণ আনিল—স্বপ্ন কি সত্যই সফল হবে? ১৯শে জুন ক্যাম্পে বসে আছি—এমন সময় বেতারযন্ত্র বেজে উঠলো। লাউড্ স্পীকারের তলায় সমবেত ভাবে দাঁড়িয়ে বেতার বক্তৃতা শুনলাম।

"আমি আমার বন্ধুগণকে আমার উপর বিশ্বাস রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট্ সারা জীবন আমাকে অভিযুক্ত করিয়াছে, এবং এগারো বার কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারাও আমাকে বশীভূত করিতে পারে নাই।......"

"চিরজীবন আমি ভারতের সেবক।...আমার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভারতবর্ষেরই সেবক থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই

আমি বাস করি না কেন, একমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য ও অনুরাগ চিরদিনই থাকিবে।”

দীর্ঘ চার বছর পরে আবার সেই কণ্ঠস্বর। সুভাষচন্দ্র টোকিও থেকে বেতার বক্তৃতা দিলেন। সুভাষচন্দ্র? বিস্মিত হবো না, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করবো! “There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy.” সত্যিই কে জানতো জীবনে আবার এমন ক্ষণ আসবে, যেদিন আমার প্রিয় নেতার কণ্ঠস্বর ইথারের সমুদ্র বয়ে আবার আমার কানে এসে ধরা দেবে। জাগিয়ে দেবে সাহস আর শক্তির যাদুস্পর্শ। সুভাষচন্দ্র··· সুভাষচন্দ্র। হাজারো টুকরো টুকরো শোনা কথা ভীড় করে আসে মনে; বুঝি স্বপ্ন দেখি—

১৯৪১ এর জানুয়ারী। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে লেখা বেরোয় ‘সুভাষচন্দ্রের বিস্ময়কর অন্তর্ধান···।’ কলকাতার শীতের সূর্যও বুঝি চমকে ওঠে···ট্রাম বাসের চলতি মানুষও বোবা বিস্ময়ে স্তব্ধ হ’য়ে যায়। সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর, জাপান, জার্মানী, ইতালী, রাশিয়া···কোথায় গেলেন তিনি? কাল্পনিকের দল কতো কথাই র’চে, তাঁদের কল্পনা পল্লবিত করেন—মুখে মুখে প্রচারিত হয়—রোমাঞ্চকর অন্তর্ধান কাহিনী।

দিন ঘুরে যায়। সূর্য ওঠে, ডোবে···। উনিশশত বিয়াল্লিশের জানুয়ারী—জার্মানীর ড্রেসডেন-এর সহরের ময়দানে সুভাষচন্দ্র, হিটলার ও গোয়েরিং সমভিব্যাহারে দাঁড়িয়ে। সামনে দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে ভারতীয় সেনা দল—আজাদ হিন্দ ফৌজ। কোথায় ভারতবর্ষ—আর কোথায় ড্রেসডেন্? কেমন করে গড়ে উঠলো বিদেশের মাটিতে ভারতের এই মুক্তিকামী সেনাদল? সুভাষচন্দ্র জিন্দাবাদ!

ড্রেসডেনের ময়দানে দাঁড়িয়ে ভারতের মুক্তিকামী সেনাদল শোনে স্বাধীনদেশের শ্রেষ্ঠ নেতা হিটলারের বাণী—

"জার্মান সৈনিক ও মুক্ত ভারতবাসী! আমি স্বাধীন ভারতের নেতা মহামান্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। তিনি স্বদেশপ্রেমিক স্বাধীন ভারতীয়দের গঠন ও পরিচালনা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছেন।…তিনি চল্লিশ কোটি নরনারীর দাবী পূর্ণ করিতে চলিয়াছেন।…শ্রীযুক্ত বসু ও তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে মান্য করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, সম্মান দিবে।"…

বেতার বক্তৃতা অনেকক্ষণ থেমে গেছে। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছিলাম। হঠাৎ একটা গাছের শেকড়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাওয়ায় হোঁচট খেয়ে পড়লাম! সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ইস্, ক্যাম্প থেকে অনেকটা চলে এসেছি যে…!

ফিরে চললাম ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে আসতেই সারওয়ারের সঙ্গে দেখা!

কাছে এসে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, দেখলে তো বাজে কথা বলি নি—।

কিসের বাজে কথা?

কেনো, ফেব্রুয়ারী মাসে যে বলেছিলাম সুভাষ বাবু এখানে আসছেন। কি কথাটা সত্যি কি না?

হ্যাঁ, সত্যি।

আরো বলছি শোনো—সুভাষ বাবু এখানে খুব শীঘ্রি আসছেন:

কি করে জানলে?

সারওয়ার দার্শনিক হাসি হাসলো—'ইনট্যুইশান'—বুঝলে 'ইনট্যুইশান'—।

সারওয়ারের 'ইনট্যুইশানের' কথাই রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। সত্যিই কি সুভাষচন্দ্র আসবেন?...যদি নাই আসবেন তা হ'লে টোকিও এলেন কেন? এ সময়ে শত বিপদ মাথায় ক'রে অবশ্যই তিনি বৃথা টোকিওতে আসেন নি। আর তাঁর আজকের এ বেতার বক্তৃতা শুনলে কি মনে হয় না—যে এবার তিনি পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব ক'রতে আসছেন?...

বাস্তবিক পক্ষে, সুভাষচন্দ্রের মতন ব্যক্তিত্বশীল, সর্বজনপ্রিয় নেতারই যেন আজ একমাত্র প্রয়োজন। রাসবিহারী বসুর নায়কত্ব সম্বন্ধে অবশ্য কোন সন্দেহ প্রকাশ আমি করি না। তবু মনে হয়—সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসর জাপান-প্রবাসী থাকায় জাতীয় জীবনের সাম্প্রতিক চেতনার সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ রেখে উঠতে পারেন নি। অনেকে তাঁর নাম শুনলেও তারা তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলো। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের নাম ও কার্যকলাপের সঙ্গে কনিষ্ঠতম সৈনিক পর্যন্ত পরিচিত। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী মনকে বোঝবার ও জানবার যথেষ্ট সুযোগ প্রায় প্রত্যেকেরই হ'য়েছে।... ভেবে দেখলাম এই ভাঙাগড়ার মুখে জাতীয় বাহিনীকে নতুন উদ্যমে চালনা ক'রতে হ'লে সুভাষচন্দ্রই অদ্বিতীয়। তিনি কি আসবেন? লক্ষ লক্ষ সৈনিক এই আকুল প্রত্যাশা বুকে নিয়ে উন্মুখ হ'য়েই ব'সে রয়েছে।

আমাদের বহুজনের প্রত্যাশা অবশেষে সার্থক হ'লো। ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে এলেন। ও, কী আনন্দ আজ, কী উল্লাস, উদ্দীপনা! আশা আমাদের সত্য হয়েছে, এমনি করে সাধনাও সত্য করো ভগবান!

৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিংয়ে এক বিরাট সভা বসলো।

সেই সভায় রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভাপতিত্ব সাদরে সুভাষচন্দ্রের ওপর অর্পণ ক'রলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হ'লেন। রাসবিহারী বসু সে দিন সভায় কি ব'লেছিলেন তা জানি না—লোকমুখে শুনলেও সব কথা মনে নেই; তবে তিনি ভারতের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতার হাতেই যোগ্য বিপ্লবের ভার তুলে দিয়েছিলেন। লক্ষ কণ্ঠে গর্জন উঠেছিলো—সুভাষ চন্দ্র জিন্দাবাদ—নেতাজী জিন্দাবাদ।

ঝড়ের মতন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এ খবর। ক্যাম্পের লাউড-স্পীকারগুলো গর্জন ক'রে উঠলো নতুন সুরে। সিঙ্গাপুরের বাতাসে ভাসতে লাগলো নেতাজীর বাণী।

৫ই জুলাই বেতার যোগে আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন সংবাদ পৃথিবীতে প্রচার করা হোলো।

৬ই জুলাই আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের এক স্মরণীয় দিন। জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো এলেন সিঙ্গাপুরে। আজাদ হিন্দ সৈনিকের সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ক'রে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে অভিবাদন জানালেন। এ তো আমাদের কম গৌরবের কথা নয়! জগতের এক স্বাধীন জাত আমাদের বিপ্লবকে, আমাদের জাতীয় সঙ্ঘকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিলো! মনে পড়ে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের কথা—যিনি ভারত তথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করাকে ঘৃণার জিনিস বলে মনে ক'রে বলেছিলেন—"The respect of British Empire is being affected in making pact with the halfnaked fakir of India।"...আশ্চর্য দম্ভ এই বৃটিশ জাতির! চল্লিশ কোটি ভারত-বাসীকে উলঙ্গ ক'রে যারা নিজেদের ঘৃণিত স্বার্থ বজায় রাখে তাদের

দস্ত অত্যাচারীর অত্যাচারেরই নামান্তর। বৃটিশ সভ্য হোক ক্ষতি নেই—কিন্তু এই যদি তাদের সভ্যতার পরিচয় হয়, জগতের সমস্ত অভিধানে সভ্য কথার নতুন অর্থ লেখা উচিত।...জাপান যাই হোক্—তার ভদ্রতা, তার ব্যবহার আমরা বিস্মৃত হ'তে পারি না। তা' ছাড়া, আমাদের জাতীয় নেতা ও সঙ্ঘকে যারা সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রছে তাকে আমরাও অশ্রদ্ধা ক'রতে পারি না। এই দিন—৬ই জুলাই নেতাজী ব'লেছিলেন—"6th July of 1943 is red letter day in our history of national struggle."

৬ই জুলাইয়ের দু' একটা লেখাচিত্র না দিলে সে দিনটিকে বোঝা যাবে না।

সভা ভেঙে গেলো। নেতাজী ও জেনারেল তোজো সামরিক কায়দায় গাড়ী, মোটর সাইকেল, আরমার্ড কার, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত এক শোভাযাত্রা ক'রে যাচ্ছিলেন, তখন আকুল আগ্রহে হাজার হাজার ভারতীয়, অভারতীয় নেতাজীকে দেখবার জন্যে তাঁর গাড়ী ঘিরে ফেললো। তিনি গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে জানালেন যে, আগামী ৭ই জুলাই তিনি সকলের সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্যে 'প্যাদাং বাসার' ময়দানে হাজির হবেন।

এর পর আমি আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডারকে নেতাজী সম্বন্ধে বলতে শুনি; "ম্যায় ক্যা দেখা—এয়সা তো ম্যায় কভি নেহি দেখা। কেতনা খুব সুরত হ্যায়—এয়সা আদমী হোতা হ্যায়—!"

সাতই জুলাই 'প্যাদাং বাসার' মাঠে নির্দিষ্ট সময়ে হাজারে হাজারে সর্বশ্রেণীর নরনারী ভীড় ক'রে এলো। নেতাজী ঠিক সময়ে এলেন। সে দিনের বক্তৃতায় তিনি সাধারণের কাছে তাঁর

ভারতত্যাগের কারণ বলেন। ভারতীয়দের কি কর্তব্য তাও তিনি সে সভায় জানান।

১৮ই জুলাই—

সারওয়ারের সঙ্গে মাঠে ব'সে কথা হচ্ছিলো—পাশে ছিলো এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক। সেই যুবকটি গত কাল সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে। যুবকটি আমাদের কাছে এক লোভনীয় দ্রব্য বিশেষ। অনেক কষ্টে তাকে পাকড়াও ক'রে আলাদা ক'রে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কারণ যুবকটি সিঙ্গাপুরে ছিলো, আর নেতাজীকে দেখেছে—তাঁর বক্তৃতাও শুনেছে। নেতাজীর বক্তৃতা শুনে ও আর থাকতে পারে নি, 'আজাদ হিন্দ ফৌজে' নাম লিখিয়েছে। সুন্দর চেহারা··· বেশ শিক্ষিত, ইংরেজী ভালোই জানে।

'নেতাজীকে তোমার খুব ভালো লাগলো ?'

তিনি Heavenly.

তুমি ৬ই জুলাইয়ের 'প্রশেসান' দেখেছিলে ?

হ্যাঁ, তবে ভীড়ে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারি নি—।

৭ই জুলাই—তুমি 'প্যাদাং বাসার' ময়দানে নেতাজীর বক্তৃতা শুনতে যাও নি ?

নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম। সেদিনের বক্তৃতা আমায় ভীষণ অভিভূত করেছিলো।

নেতাজী কি বললেন ?

তিনি কেন ভারত ত্যাগ করেছিলেন—সে কথা এবং আরো অন্য কথা বললেন।

কেন তিনি ভারত ত্যাগ করেছিলেন? সারওয়ার ঝানু উকীলের মতন প্রশ্ন ক'রলো।

তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে থেকে তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার সব রকম চেষ্টাই করেছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেন ভারতবাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কবলে পড়ে এতো অত্যধিক নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত যে তারা শুধু বাইরে গরীব নয়, অন্তরেও গরীব—জাতীয় ভাব ধারা তাদের মরে গেছে। এক্ষেত্রে এই দুর্বল জাতকে দিয়ে দেশের মধ্যে থেকে বিপ্লব করা চলে না। এরা সাহস পেতে পারে, দাঁড়াতে পারে, যদি বাইরে থেকে সাহস সামর্থ্য, অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা যায়। ··তিনি বলেছিলেন—there is no such Indian leader who can demand to have many sided experience, that which I have...সত্যই কি তাই ?

অবশ্যই—আমরা বললুম।

তিনি আর কি বললেন— ?

ভারতের ভেতোরের সংগ্রামকে সাহায্য করবার জন্যে তিনি বাইরে এসেছিলেন—।

এই সভায় যেতে না পারার জন্যে আমার মন কেমন করছিলো। 'সেদিনের সভার দু' একটা অন্য খবর না বললে বুঝবে না সে কী কাণ্ড হ'য়েছিলো'—এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবকটি বললো। নেতাজী বক্তৃতা দিতে দিতে ভাবাবেশে প্রশ্ন করেন—কে কে দেশের জন্যে জীবন দেবে? তখন সেই প্রবল জনসমুদ্রে ঝড় জাগলো যেন। সকলেই আগে প্রাণ দিতে যাবার জন্যে রাজী। রীতিমত প্রতিযোগিতা। সৈনিকরা বন্দুক উঁচু ক'রে, বাদ্যকারেরা ঢাক ঢোল বাজিয়ে, যাদের কিছু নেই তারা শুধু খালি হাত উঁচু ক'রে আগে নেতাজীর সামনে যাবার জন্যে প্রতিযোগিতা সুরু ক'রলো—সে কী কাণ্ড!

তারপর—? সাগ্রহে প্রশ্ন করলুম।

নেতাজীর ভাবাবেশে চোখ বুজে গিয়েছিলো। তাঁর পাশের একজন সহকারী সজোরে তাঁর ডান হাত ধরে টেনে নীচে নামিয়ে দিতেই তাঁর আবেশ ভাঙলো। তিনি সকলকে ফিরে গিয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসতে বললেন।....এই সময় তিনি 'দিল্লী চলো' এই কথা (War Slogan) সমবেত জনতাকে উপহার দেন।

আমরা যেনো চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম সেই উন্মত্ত জনসভা !···কিন্তু কল্পনার স্থায়ীত্ব কতটুকু। মুহূর্তে বুঝতে পারলুম —সে সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আর এ্যংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটির কাছে শেষ কথাগুলো শুনে সে সভায় যোগ দিতে না পারার কষ্ট আরো বেড়ে গেলো।

সে প্রাণশক্তির স্ফূরণ ক'জন অনুভব করতে পারে, যে প্রাণশক্তির প্রচণ্ড তাড়নায় মরা গাছে ফুল ফোটে, মরুপথে হারানো নদীর ধারা আবার স্রোতোময়ী হ'য়ে সাগরে গিয়ে মেশে? যৌবনের দীপ্ত তেজ, কর্মশক্তি, ক্লান্তিহীন গতি—এ তো শুধু বইয়ে পড়া কথা নয়—এরও স্ফূরণ আছে। আমরা ভারতবাসীরা প্রাণশক্তিকে জানবার মতন সময় পাই না—কারণ শক্তিহীন কোনদিন শক্তির অনুভূতি পেতে পারে না। তবু ঈশ্বরের কৃপায়, পথ ভোলা দেবদূতের মতন মাঝে মাঝে দু-চার জন ভুল করে আমাদের মধ্যে এসে পড়েন —আর তাঁদের মধ্যেই দেখি প্রাণধর্ম ও প্রাণশক্তির অপূর্ব স্ফূরণ।

নেতাজী সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত পূর্ব এশিয়ায় জাগরণের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। দিন নেই, রাত্রি নেই—জল বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে দিনের পর দিন যে কোনো জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তিনি অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। সমস্ত মালয় আর পূর্ব এশিয়ায় তাঁর সফর শেষ

হয়ে গেছে। আশ্চর্য না হয়ে আমরা পারি না, ভাবি এতো প্রাণ-প্রাচুর্য তাঁর এলো কোথা থেকে ?

আমাদের ক্যাম্পে রেডিওর সামনে বড় ভীড়। লাউড্-স্পীকারটাও ততো ভালো নয়—শব্দ তো নয়, যেনো হাঁড়ির ভেতর থেকে শব্দ বেরুচ্ছে।

অফিসারস ক্যাম্পের রেডিয়োটা ভালো। তা ছাড়া সেখানে ভীড় কম। মেজর সিং আমায় বেশ একটু ভালবাসেন।

যেন জরুরী দরকারে গিয়েছি এমন ভাবে মেজর সিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। মেজর সিং হাসেন। তিনি জানেন কেন আমি তাঁর কাছে যাই। একটু কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরকারী উপদেশ দিচ্ছেন এই রকম একটা ভঙ্গী নেন।

রেডিয়োয় নেতাজীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে আজ থেকে সৈন্যদের পরিচালনা ভার আমি গ্রহণ করলাম! ভারতের মুক্তিসেনার সেনাপতি হবার চেয়ে বড় গৌরব আমার পক্ষে আর কিছু থাকতে পারে না।

আটত্রিশ কোটি নরনারীর স্বার্থ"........

নিস্তব্ধভাবে আমরা সকলে রেডিয়োর দিকে তাকিয়ে—যেন নেতাজীর কণ্ঠ আমাদের সমস্ত আত্মাকে যাদু করে নিয়েছে।

"আমরা যে সেনাবাহিনী গঠন করবো—আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে তাতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে হবে। সেই সেনাবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য হবে—ভারতের স্বাধীনতা!

"জয় আমাদের হবেই। 'দিল্লী চলো' বলে আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ করি। ভারতের রাজধানীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দের বিজয় উৎসব না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিরতি নেই।"

রেডিয়ো থেমে যায়। ঘরের বাতাসে অনুরণিত হয় নেতাজীর দীপ্ত কণ্ঠস্বর। কেমন যেনো অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—কী যে শুনলাম কিছু মনে পড়ছে না—কেবল উদ্দীপ্ত রোমাঞ্চকতায় সারা দেহের স্নায়ুতে কেমন যেনো একটা উত্তাপ।

মেজর সিং গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিলেন। খুব বেশী impressed হয়েছো না?

হ্যাঁ—। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের রক্ত আছে সেই বোধ হয় impressed হবে—

ঠিক বলেছো, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত। নেতাজীর বক্তৃতা শুধু কতকগুলো কথার সমষ্টি নয়, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের গর্জন—বিপ্লবের গান—নিঃশব্দে আমি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম। বেশ একটু অন্ধকার। আকাশে মেঘ জমেছে।

কী জানি কেন কাজী নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতাটা গলা থেকে গুমরে উঠলো—

'বল বীর, চির উন্নত মম শির,
শির নেহারী নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর।'

২৫শে আগষ্ট নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন।

জুন মাসের শেষাশেষি থেকে আমাদের চিঠি লেখবার সুযোগ এসেছে। চিঠিগুলো কেমন ভাবে কোন উপায়ে যে দেশে যাবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আমাদের নেই। অনেকে বিশ্বাস করতে পারে নি যে, এ চিঠি দেশে যেতে পারে—তাই ওদিক মাড়ায় নি! অনেকে আবার অত্যন্ত 'হোম্ সিক্' হয়ে পড়ায়, সুযোগ পেলেই চিঠি দিতে লাগলো—চিঠি যাক্ আর নাই যাক্।

গোড়ায় আমি বিশ্বাস করি নি যে এ চিঠি বাড়ী পৌছতে পারবে। শেষ পর্যন্ত একটা চিঠি লেখবার জন্য বড় বেশি উতলা হয়ে পড়লাম। তাই আজ দিন দুয়েক আগে সমবয়সী মাসতুতো বোনটিকে একটা চিঠি দিয়েছি। সে বেচারী বড় ভালবাসতো আমায়—। যখন যুদ্ধে নাম লিখিয়ে চ'লে আসি তার সেই অভিমান-ভরা অশ্রুসজল চোখ দুটোই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সবচেয়ে বড় বাধা আর ব্যথা।

বোনটিকে চিঠি দিয়েছি। জানি না সে পাবে কি না? যদি না পায়—আর যদি নেহাত ভাগ্যের কৃপায় কোনদিন ফিরে যেতে পারি বাড়ীতে, সে দিন তাকে বলবো যুদ্ধক্ষেত্রের সহস্র কোলাহল আর নিষ্ঠুরতার মাঝেও তার কল্যাণময়ী স্নেহমূর্তি আমি ভুলি নি। সুযোগ এলেই তাকে মনে করে চিঠি দিয়েছি, আর সে চিঠির নকল রেখেছি ডায়েরীর খাতায়।

"ভাই—আজ সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখ। সাল হচ্ছে ১৯৪৩; দীর্ঘ দুবছর আগে তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি। এতো-দিন পরে আমার চিঠি লেখবার সুযোগ এসেছে। কিন্তু এ চিঠি তোমার হাতে পড়বে কি না জানি না। যদি পড়ে সে আশায় লিখছি।

"কোথায় আছি তা তো বলতে পারবো না। যুদ্ধনীতিতে তা জানানো নিষেধ! তবে যেখানে আছি সে জায়গাটা বেশ সুন্দর। চারপাশে রবার গাছ। রবারের জঙ্গলই বলা চলে। ক্যাম্পগুলো আরো মজার। গোলপাতার ছাউনি, গোলপাতারই দেওয়াল। কাঠের তক্তা দিয়ে ওপর তলা নীচের তলা ভাগ করা। এক এক-খান লম্বায় ত্রিশ চল্লিশ হাত। এক এক ঘরে চল্লিশ পঞ্চাশ জন থাকি।

"জাপানীদের হাতে বন্দী হবার পর দিন পনেরো নানা কষ্ট গিয়েছিলো। এখন সে সব কষ্ট একেবারেই আর নেই। খাওয়া দাওয়া রীতিমত ভালো। ভাত, রুটি, সি ফিস্, টিন ফিস্, চা, চিনি, দুধ সবই পাওয়া যায়।

"তা বলে ভেবো না যেনো শুধু খেয়েই আমাদের দিন কাটছে। কাজও করতে হয় নানা রকম। ধরা বাঁধা নিয়ম।

"আমি এখানে ক্যাম্পে তাস খেলা শিখেছি। আমরা ভলি, তাস ইত্যাদি নানারকম খেলা খেলতে পাই।

"আর বেশি কিছু লেখা চলবে না। হয়তো এই লেখাই সেন্সার হবে। তা না হলে অনেক লিখতে পারতাম—একটা মহাভারত।

"আমি ভালো আছি। তোমরা সুস্থ এবং নিরাপদে থাকো ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা। আমার স্নেহাশিস জেনো।"

অমিত ফিরে এসেছে। দিন কয়েক আগে সে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলো। সিঙ্গাপুর এখান থেকে মাইল তিনেক মাত্র। আমায় চুপি চুপি এসে বললো—

'বোস্, একটা কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে!' আমি চম্‌কে উঠলাম। অমিতের কেলেঙ্কারী মানে—ভীষণ একটা কিছু। বললাম কি করলে আবার? অমিত নিচুস্বরে বললো—' মল্লিকের ঘড়িটা বিক্রী ক'রে দিয়েছি।' 'তার মানে?"—অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকলাম।

'অন্য লোকের ঘড়ি তুমি বিক্রী করলে কেন?'

একটু চুপ ক'রে অমিত যেন তার দুর্বলতাকে দূর ক'রে নিলো।

তারপর হেসে বললো—'কি ক'রবো—I could not check…! মালয়ীজ মেয়েটিকে নিয়ে রেঁস্তোরায় দাঙ্গাই হ'য়ে গেলো। দেখো না শালারা বাঁ হাতখানাকে কী রকম জখমই না করেছে।…' অমিত হাতখানা বাড়িয়ে দিলো। বেশ জবর রকমের জখম। একটু চুপচাপ থেকে অমিত নিজেই আবার কথা কয়ে উঠলো—'বুঝলে বোস, আমি মল্লিককে ম্যানেজ ক'রে নেবো, তবে নেহাতই যদি গড়বড় ক'রে, তোমায় একটা কাজ করতে হবে—টাকা দেবো, ঠিকানা দেবো, ঘড়িটা ফেরৎ নিয়ে আসতে হ'বে।….

অমিতের কথায় আশ্বস্ত হলুম। শেষ পর্যন্ত যে ব্যাপারটা এখানেই থেমেছে এই যথেষ্ট।

By the bye—এক নতুন খবর শোনো। নেতাজী খুব শীঘ্র এখানে আসছেন। সাবমেরিণে জনা চারেককে নাকি সুন্দরবনে রেখে আসা হ'য়েছে। তারা চাটগাঁয় গিয়ে 'কন্‌টাক্ট' করবার চেষ্টা ক'রবে।…

'রিক্রুটমেণ্ট্ সম্বন্ধে কিছু শুনলে—?'

'হ্যাঁ। বোধ হয় সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই সুরু হ'বে—।'

'আর নতুন কিছু শুনেছো—?'

'উড়ো খবর শুনেছি দু'চারটে—তবে মনে নেই কিছু। নট্ সো ইম্‌পরট্যাণ্ট্ ·"

অমিত চ'লে গেলো।..

অদ্ভুত ছেলে এই অমিত। আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো। শরীরের গড়ন নিগ্রো ধরণের। মাংস গুলো যেন ইস্পাত। হিংস্র চোখ, সব সময় জ্বলজ্বল করছে। দক্ষিণ কোলকাতায় বাড়ী; মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে যুদ্ধের খাতায় নাম

লিখিয়েছিলো। ভীষণ রেক্‌লেস। জীবনে তার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। খেয়াল এবং খুসিটাই তার কাছে জীবন। সংযমের ধার ধারে না, চরিত্র নিয়ে কোনাদিন মাথা ঘামায় নি—! যতো বদগুণ তা সবই প্রায় ওর আছে। কিন্তু আশ্চর্য, সে বদগুণের সঙ্গে কতকগুলো এমন সদগুণ আছে যা কোনোমতেই ওর কাছে আশা ক'রতে পারা যায় না।

অনেকদিন পরে আবার সিঙ্গাপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চমৎকার সহর সিঙ্গাপুর। জাপানীরা এর নতুন নাম-করণ করেছে 'শোনান'। সিঙ্গাপুর সহরটা লম্বায় ২৭ মাইল, প্রস্থে ১৪ মাইল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আধুনিক রুচিসম্মত এর গৃহসজ্জা। পিচ ঢালা বড় বড় রাস্তা। সভ্যজগতের সব রকম যানবাহন এখানে দৃষ্ট হয়।

মিত্রপক্ষ সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার পর—বা সিঙ্গাপুর জাপানের হাতে আসার পর—যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব এর সংস্কার-কার্য চ'লছে।

সিঙ্গাপুর বাসীদের মধ্যে এখন আর সেই আগেকার উদ্বেগ নেই, নতুন জীবন ধারার সঙ্গে তারা পরিচিত হ'য়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠভাবে। সহজ করে নিয়েছে পরিবর্তনটা।

সিঙ্গাপুরে আমায় যে জিনিসটা সবচেয়ে বিস্মিত করে, তা হ'চ্ছে এদের জীবন ধারণের চাকচিক্য। বোঝবার উপায় নেই, কে গরীব, আর কে ধনী। পথে ঘাটে রেষ্টুরেণ্ট, সিনেমা ইত্যাদি। পায়জামা আর ঢিলে পাঞ্জাবী পরা পুরুষদের দল সব সময় ভীড় করে থাকে। তাদের মাথায় টারকিশ ক্যাপ গুলো ঘন ঘন নড়ে। সিল্কের লুঙ্গী এ দেশের মেয়ে পুরুষের জাতীয় পোষাক। উৎসবের দিনে পুরুষরা রঙ্গীন বাহারি পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে লুঙ্গীর সঙ্গে সমতা রাখে আর মেয়েরা পরে খুব ঢিলে লম্বা হাতওয়ালা ব্লাউসের মতন জামা।

মিলিটারী ট্রাকে আমরা সহরের মাঝখানে এলাম। সেরাঙ্গুন রোড্ !

সেরাঙ্গুনে এলেই আমার সিঙ্গাপুরে আসার প্রথম দিনটা মনে পড়ে। ৬ই ফেব্রুয়ারী (সর্বপ্রথম যখন সিঙ্গাপুরে এসেছিলাম) সিঙ্গাপুর দেখতে এসে ঠিক যখন সেরাঙ্গুন রোডে পৌঁছেছিলাম—সে সময় হঠাৎ জাপানী প্লেন্ এসে বোম্বিং সুরু ক'রলো। আমরা ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলুম। সেই সেরাঙ্গুন। জাপানীদের হাতে এসে আবার নব সজ্জায় সংস্কৃত হ'চ্ছে।

পথে রমেশ বাবুর (পুরো নাম রমেশচন্দ্র ঘোষ) সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। প্রথম দিনই রেস্তোঁরায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। তারপর সে আলাপ নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হ'লো।

রমেশ বাবু প্রায় ছুটে এসে হাত চেপে ধরলেন।

'কি মশাই, লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছেন যে—!'

'লুকিয়ে কোথায়; আপনার ওখানে যাবো ব'লেই পালাচ্ছি।'

'তাই নাকি,—কী সৌভাগ্য, আসুন—!

রমেশ বাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীর পথে চললাম। বীচ রোডে তাঁর ছোট একতালা বাড়ী, সমুদ্রের গা ঘেঁসে। সারাক্ষণ সমুদ্রের ঝির ঝিরে বাতাস বয়।

'আপনার ফার্ম কেমন চলছে?'—প্রশ্ন করলুম।

'এক রকম!'

রমেশ বাবুর এখানে ছোটো খাটো একটা এগ্রিকালচারাল্ ফার্ম আছে। এ থেকে তাঁর মন্দ আয় হয় না।

বাড়ী পৌঁছে বৈঠকখানায় স্থায়ী হ'লাম। রমেশ বাবুর বৈঠকখানায় বাঙালী সংস্কৃতির ছাপ। দু আলমারী ভর্তি বাছাই করা বই। স্বামী

বিবেকানন্দের জীবন চরিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, গান্ধীজীর আত্ম-কাহিনী, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, নেতাজীর Indian Struggle... ইত্যাদি।

খবর পেতেই রমেশ বাবুর স্ত্রী এলেন। অনেকদিন না আসার জন্য অভিযোগ ক'রলেন।

'কি ক'রবো বলুন—কাজ কর্মের ফাঁক পেলেও সব সময় আসা হয়ে ওঠে না! তবে এলে আপনাদের সঙ্গে দেখা করি।

তারপর খুচরো কথা। প্রবাসী হ'লে কী হয়, বাঙালী মেয়ের সেই স্নিগ্ধ সহানুভূতি সুখ দুঃখের প্রত্যেকটি কথা খুঁটিয়ে প্রশ্ন।

রমেশ বাবুর সঙ্গে গল্প হ'লো।

'বাংলা দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ লেগেছে। হাজার হাজার লোক ম'রছে। নেতাজী তো এখান থেকে আগষ্ট মাসে রেডিয়ো মারফৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি ১ লক্ষ টন চাল পাঠাতে রাজী। বর্মার যে কোনো বন্দর থেকে ওরা নিরাপদে চাল নিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য কোনো উত্তর নেই।

'আত্ম-অহমিকায় ঘা লাগছে যে!'

'অযোগ্যের আত্ম-অহমিকা!'

'আর কি খবর?

'শোনান, কুয়ালালামপুর, সেলেটার—এই তিন জায়গায় আই. এন. এ.-র ট্রেনিং সেণ্টার হ'য়েছে।'

'সেরাম্বন—?'

'ও হ্যাঁ, এই তো ৬ই সেপ্টেম্বরে সেরাম্বনে ট্রেনিং সেণ্টার খোলা হ'লো।'

অক্টোবর—

২১শে অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গৌরবময় দিন।

সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং এর 'দাইতোয়া জেকিজো' হলে বেলা সাড়ে দশটার সময় ভারতীয়দের বিরাট সম্মেলন হ'য়ে গেলো। ইতিপূর্বে সিঙ্গাপুরে এত বড় সম্মেলন আর কখনো হয় নি। বিশেষতঃ যে ঐতিহাসিক প্রাধান্য এই সম্মেলনকে যুগজয়ী করে রাখবে, তেমন কোনো কিছু সারা এশিয়ায় আর কখনো ঘটে নি।

এই দিন আমি সে সম্মেলনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা ক্যাথে বিল্ডিংয়ে হাজির হ'লাম। কেন না, বিলম্বে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসতে হ'বে, তা জানতাম।..হায় ঈশ্বর, সাড়ে সাতটায় গিয়েও কি নিস্তার আছে! লোকে লোকারণ্য। মনে হয়, তারা যেনো সারা রাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে বিরক্তির লেশমাত্র নেই, তার বদলে উত্তেজনা আর দৃঢ়তার ছাপ।

ক্রমশই লোক আসছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, বয়সের কোনো বালাই নেই। সর্বজাতের সর্বশ্রেণীর লোক। অভিজাত শ্রেণীর ভদ্রলোকটি থেকে সুরু করে ফিটফাট নগণ্য রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত।

বেলা বেড়ে চ'ললো···তার সঙ্গে জনারণ্য ও কোলাহল। দশটা বেজে গেলো। ঘন ঘন 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ' ও 'নেতাজী জিন্দাবাদের' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠেছে।···সাড়ে দশটা প্রায় বাজে এমন সময় অদূরে নেতাজীর গাড়ী দেখা গেলো। জনতা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তারা রুদ্ধ উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারলো না—সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো 'নেতাজী

জিন্দাবাদ'। ঘন ঘন শ্লোগান্। নেতাজী দেব সুলভ স্মিত হাসিতে সকলের অভ্যর্থনার প্রত্যভ্যর্থনা জ়ানিয়ে সভায় প্রবেশ ক'রলেন।...

জনতা অদ্ভুত ধৈর্য নিয়ে, শান্ত ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো...।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু নেতাজীকে অভ্যর্থনা ক'রে তাঁর স্বাগত অভিভাষণ পাঠ ক'রলেন। তারপর কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জি স্বাধীনতা সংঘের কার্য বিবরণী পাঠ ক'রলেন।

এরপর নেতাজীর আবেগময়ী বক্তৃতা। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে হিন্দী ভাষায় তিনি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠার প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর বক্তৃতার সারাংশ পরে তামিল ভাষায় অনুবাদ ক'রে বোঝানো হ'লো।...তাঁর সে বক্তৃতা আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রে আছে। আমিও তা টুকে রেখেছি।

৩৮ কোটি নরনারীর মুক্তির ব্রত তিনি অনেক আগেই গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা কার অজ্ঞাত? শত দুঃখ অত্যাচার, যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য ক'রেছেন তিনি—এই ব্রত উদযাপনের জন্যে। তবু আজ নবগঠিত ভারতের মুক্তি-সাধক দলের কাছে তিনি আবার শপথ গ্রহণ ক'রলেন। জনগণের জয়োল্লাসের আবর্তে তাঁর কণ্ঠস্বর বিলীন হ'য়ে গেলো। আবেগে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলো তাঁর দীপ্ত স্বর। সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন—"আমি চিরদিন ভারতের ৩৮ কোটি ভ্রাতা ও ভগিনীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত ক'রবো। আমার জীবনের সর্বোচ্চ কর্তব্য এ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীনতা অর্জন ও তা রক্ষা ক'রবার জন্যে আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমি ব্যয় ক'রবো।"

নেতাজীর শপথ গ্রহণের পর প্রত্যেক সদস্যের শপথ গ্রহণের পালা। স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি সদস্য

নেতাজীর সামনে এসে আবেগ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে শপথ গ্রহণ ক'রলেন— "ঈশ্বরের নামে আমি শপথ গ্রহণ করছি—৩৮ কোটি স্বদেশবাসী ও ভারতের মুক্তি সাধনের জন্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে সর্বদা আমি বিশ্বস্ত থাকবো এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার জীবন বিসর্জন দিতে আমি সর্বদা প্রস্তুত।"

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা—

"স্বাধীনতা আজ আসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা, এবং সে গভর্ণমেণ্টের পতাকাতলে সমবেত হ'য়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক নেতা আজ কারাগারে ; জনসাধারণও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ অবস্থায় ভারতে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা বা সে গভর্ণমেণ্টের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সে জন্য পূর্ব এশিয়ার 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের' কর্তব্য—স্বদেশ ও বিদেশস্থ সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সমর্থন নিয়ে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা। ভারত থেকে বৃটিশ এবং তাহার মিত্রদের বিতাড়িত ক'রবার জন্য অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে সংগ্রাম চালাতে হবে।

"ভগবানের নামে অতীতযুগে যাঁহারা ভারতীয় জনগণকে সুসংবদ্ধ ক'রেছিলেন, তাঁদের নামে এবং যে সমস্ত পরলোকগত বীর আমাদের কাছে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন, তাঁদের নামে আমরা ভারতীয় জনসাধারণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্যে এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণের জন্যে আহ্বান করছি। যতদিন না শত্রু ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়,

আর যতদিন না ভারতবাসী আবার স্বাধীন হয় ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম, সাহস, অধ্যবসায়, এবং চরম জয়ের আস্থা নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে।"

"১৭৫৭ সালে বাঙলা দেশে বৃটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতীয় জনগণ একশত বৎসর ধরে অবিশ্রান্তভাবে অক্লান্ত সংগ্রাম ক'রেছে। এই সময়কার ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাংলার সিরাজ, মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হায়দার আলী, টিপুসুলতান, ভেলুতাম্পি, মহারাষ্ট্রের আপ্পাসাহেব ভোঁসলা, পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিংহ অতিরি ওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপী, ডুমরাওয়ের মহারাজা কুনোয়ার সিং, নানা সাহেব এবং আরও বহু বীরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে, বৃটিশ সমগ্র ভারত গ্রাস ক'রতে উদ্যত। কাজেই তাঁরা সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান নি। শেষে যখন ভারতীয় জনগণ অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারলো তখন তারা সম্মিলিত হ'লো। ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের অধিনায়কত্বে স্বাধীন জাতি হিসাবে তাদের শেষ সংগ্রাম। যুদ্ধের প্রথমভাগে কয়েকটি জয়লাভ সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্বে ধীরে ধীরে তাদের চরম পরাজয় ও পরাধীনতা এনে দিল। তবু ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া টোপী, কুনোয়ার সিং, নানা সাহেব জাতির আকাশে চিরন্তন নক্ষত্রের মতন জ্যোতিষ্মান থেকে আমাদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার প্রেরণা দিচ্ছেন।

"১৮৫৭ সালে বৃটিশরা সবলে ভারতীয়দের নিরস্ত্র ক'রে দেয় এবং আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজত্ব সৃষ্টি করে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের

জন্মের পর ভারতের নব জাগরণ হ'লো। ১৮৮৫ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন, প্রচারকার্য, বৃটিশদ্রব্য বর্জন, সন্ত্রাসবাদ, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন প্রভৃতি সর্বোপায়ে এবং অবশেষে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নিয়েছে। কিন্তু সবই বার্থ্যতায় পর্যবসিত। শেষে ১৯২০ সালে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে ভারতবাসী যখন নতুন পন্থার সন্ধান ক'রছিলো, তখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগিতা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নতুন অস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'লেন।

এর পর ২০ বৎসর ভারতীয়রা নানাপ্রকার দেশপ্রেমমূলক কার্য করে। মুক্তির বার্তা ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছায়। ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য নির্যাতন বরণ করতে শিখলো, শিখলো আত্মত্যাগ করতে এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। ভারত শুধু রাজনৈতিক চেতনাই লাভ করলো না। একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণতি লাভ করলো। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আটটি প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলের কাজের দ্বারা ভারতীয় জনগণ প্রমাণ দিল যে, তারা তাদের নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেরা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

বিদেশে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক চেতনালাভ করেছে এবং একটি প্রাতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এ নতুন ঘটনা। তারা শুধু স্বদেশে তাদের দেশবাসীর সঙ্গে সমানভাবে চিন্তা করছে না, স্বাধীনতার পথ ধরে তারা তাদের সঙ্গে একতালে চলেছে। পূর্ব এশিয়ায় আজ ২০ লক্ষাধিক ভারতীয় এক সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়েছে। তারা পূর্ণ সমরায়োজন ধ্বনিতে অনুপ্রাণিত। তাদের সামনে রয়েছে ভারতের আজাদ হিন্দ ফৌজ, তাদের মুখে এক কথা 'দিল্লী চলো'।

"ভণ্ডামির দ্বারা ভারতীয়দের হতাশাচ্ছন্ন ক'রে, লুঠতরাজ ক'রে, তা'দের অনাহার ও মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় ভারতীয়দের শুভেচ্ছা থেকে বঞ্চিত ক'রেছে, এক্ষণ তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক। সেই অস্বস্তিকর শাসনের শেষ চিহ্নটির মূলোৎপাটন করবার জন্যে একটামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হ'বে। সেই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করবার ভার আজাদী ফৌজের উপর। স্বদেশে অসামরিক জনগণের ও বৃটিশ সরকারের গঠিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বহু লোকের সমর্থনে এবং বিদেশে আমাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে ভারতীয় আজাদী ফৌজ তাদের কর্তব্য সাফল্যের সহিত পালন করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

"পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ এখন আজাদ হিন্দের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন ক'রেছেন। এখন আমরা আমাদের পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কর্তব্যে অবতীর্ণ হ'য়েছি। ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের কাজ এবং মাতৃভুমির মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম তাঁর শুভ আশীর্বাদে মণ্ডিত করুন। দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য, এবং বিশ্বের দরবারে তাঁকে উন্নীত করবার জন্য আমরা আমাদের এবং সঙ্গী ও সহকর্মীদের জীবন পণ করছি।

"অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য দাবী করে, এবং আনুগত্য লাভের যোগ্য। এই গভর্ণমেণ্ট ধর্মগত স্বাধীনতা এবং সমস্ত অধিবাসীর জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা ক'রছে যে, দেশের সমস্ত সন্তানকে সমানভাবে পোষণ ক'রে এবং বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সৃষ্ট সর্বপ্রকার বিচ্ছেদ অতিক্রম ক'রে সমগ্র দেশের এবং সমস্ত অংশের সুখ সমৃদ্ধি বিধানের পথে অগ্রসর হ'তে দৃঢ় সঙ্কল্প।"

ঘোষণার নীচে নেতাজী এবং তাঁহার মন্ত্রীবর্গের সই।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে—

সুভাষচন্দ্র বসু

(রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান মন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র সচিব)

লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামিনাথন

(নারী সংগঠন)

এস. এ. আয়ার

(প্রচার)

লেঃ কঃ এ. সি. চ্যাটার্জি

(অর্থবিভাগ)

এ. এম. সহায়

(মন্ত্রী পদমর্যাদা-সম্পন্ন সেক্রেটারী)

সমর পরিষদ (War Council)

লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ

লেঃ কঃ এন এস. ভগৎ

লেঃ কঃ জে. কে. ভোঁসলে

লেঃ কঃ গুলজারা সিং

লেঃ কঃ এম. জেড্. কিয়ানি

লেঃ কঃ এ. ডি. লোকনাথন্

লেঃ কঃ এহসান্ কাদির

লেঃ কঃ শাহ্‌নওয়াজ খান

(সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধি)

পরামর্শদাতা (Advisory Committee)

রাসবিহারী বসু

(প্রধান পরামর্শদাতা)

করিম গণি

দেবনাথ দাস

ডি. এম. খাঁ

এ ইয়েলাপ্পা

জে. থিবি

সর্দার ঈশ্বর সিং

(পরামর্শদাতাগণ)

এ. এন. সরকার

(আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা)

...অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পাঠ শেষ ক'রে নেতাজী বলেন :

"জাতীয় সেনাদল গঠনে পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন বাস্তব রূপ গ্রহণ ক'রেছে। যদি ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ এই মুক্তি সেনাদল গঠন না ক'রতেন, তা হ'লে এ প্রতিষ্ঠান মাত্র প্রচার-মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হ'তো। আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এই গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লো। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আগামী ও শেষ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ থেকে এই গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

"আমরা এই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর ইতিহাসেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। ১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আয়ারের

অধিবাসী ও চেকোশ্লোভেকিয়ার অধিবাসীরা তাঁদের নিজেদের শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে আনাতোলিয়ায় তুরস্কের অধিবাসীরাও তাঁদের গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেন।”

…আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা ও নেতাজীর বক্তৃতার পর হাজার হাজার নরনারী উঠে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন।

শুভ্ সুখ্ চাইন কি বরখা বরষে ভারত ভাগ্ হায় জাগা
পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হিমালা নীলা যমুনা গংগা
তেরে নিত্ গুণ গায়ে
তুঝসে জীবন পায়ে
সব তন পায়ে আশা—
সুরয্ বন্ কর্ জগ পর্ চম্‌কে ভারত নাম্ সুভাগা
জয়-হো জয়-হো জয়-হো
জয় জয় জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা।

সব্‌কে দিল মে প্রীত বসায়ে তেরি মিঠি বাণী
হর সুবেকে রহনেওয়ালে হর মজহব কে প্রাণী
সব ভেদ্ আউর্ ফারাক মিটাকে
সব গোদমে তেরি আকে
গুনথে প্রেম কি মালা
সুরয্ বন্ কর্ জগ্ পর্ চম্‌কে ভারত নাম সুভাগা

জয়-হো জয়-হো জয়-হো
জয় জয় জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা।

সুবা সবেরে পঙ্খ পখেরু তেরে হি গুন গাঁয়ে
বাস ভরী ভরপুর হাওয়ায়েঁ জীবন মে রুত লায়েঁ
সব্ মিল্ কর্ হিন্দি ফুকারে
জয় আজাদ হিন্দ কে নারে
পিয়ারা দেশ হামারা
সুরয্ বন্ কর্ জগ্ পর্ চম্কে ভারত নাম সুভাগা।
জয়-হো জয়-হো জয়-হো
জয় জয় জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা।

আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ :—

'আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ' ছিলো একটা সমিতি, আর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' ছিলো একটা সামরিক প্রতিষ্ঠান। এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগাযোগ না থাকায়—উভয় দলের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে মতভেদ ও মনভেদ প্রকট হয়ে পড়ে। রাসবিহারী বসু আর মোহন সিংয়ের ঘটনাটাই তার সবার বড় প্রমাণ।

নেতাজী 'গভর্ণমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করে এ সমস্যার সমাধান ক'রলেন। সেনাদল গভর্ণমেণ্টের অধীন হ'লো, আর 'আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ' থাকলো প্রবাসী ভারতবাসীদের একটা সমিতি হ'য়ে, অবশ্য সঙ্ঘই ছিলো মূল প্রতিষ্ঠান যার পরিণতি ফৌজ এবং গভর্ণমেণ্ট এই দুই ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

নেতাজী এই সঙ্ঘের সভাপতি, গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রনায়ক (Head of State) আর ফৌজের সর্বাধিনায়ক হ'লেন।

আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় হ'লো সিঙ্গাপুরে! সুমাত্রা, জাভা, মালয়, ব্রহ্ম, শ্যাম, ইন্দোচীন সর্বত্র যেখানেই ভারতবাসী আছে, সেখানেই এই সঙ্ঘের শাখা বর্তমান।

প্রত্যেক শাখায় নিম্নলিখিত বিভাগ রাখা হ'লো—

(১) সৈন্য সংগ্রহ বিভাগ :—

এ বিভাগের কাজ হ লো আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য পূর্ব এশিয়ার বেসামরিক অধিবাসীদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা।

(২) সরবরাহ বিভাগ :—

এই বিভাগের কাজ হ লো আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ, পোষাক, ওষুধ, ইত্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

(৩) অর্থসংগ্রহ বিভাগ এবং অর্থনৈতিক বিভাগ :—

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের জন্য স্বেচ্ছাদত্ত অর্থ সংগ্রহ করা ও গভর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

(৪) প্রচার বিভাগ :—

এ বিভাগটি প্রত্যক্ষভাবে আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ; এর প্রধান কর্তা হ'লেন আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের প্রচার সচিব। উদ্দেশ্য হচ্ছে—নবগঠিত গভর্ণমেণ্টের নীতি ও কার্যাদির প্রচার।

(৫) মহিলা বিভাগ ঃ—

মহিলাদের ভেতর আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের কাজ সুচারুরূপে পরিচালনা, ঝাঁসি রাণী বাহিনীর জন্য স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ—ইত্যাদি হ'লো এ বিভাগের অন্যতম কাজ।

(৬) সমাজ কল্যাণ বিভাগ ঃ—

এ বিভাগের কাজ—পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতীয়দের নানা রকম সাহায্য এই বিভাগটি থেকে করা হবে—দুরবস্থার মধ্যে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য, যাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করবেন—তাঁদের পরিবারদের মাসিক ভাতা দেওয়া ইত্যাদি।

(৭) সংস্কৃতি এবং জ্ঞানানুশীলন বিভাগ ঃ—

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারই এ বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যালয় স্থাপন হলো অন্যতম কাজ। বই, অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তা বোধ ও নৈতিক উন্নতি হয় তার চেষ্টা করা।

(৮) রাজনৈতিক বিভাগ ঃ—

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ এবং বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট ও তাদের কূটনৈতিক কর্মচারীদের মধ্যে সংযোগ রাখা এ বিভাগের মূল কাজ।

আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট তৈরী হওয়ার পর আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গভর্ণমেণ্টের দুই কার্যকরী শাখায় পরিণত হয়।

সঙ্ঘ এবং ফৌজের মধ্যে সম্প্রীতি বেড়ে গেলো। উভয় দলের

লোকই পরস্পরকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। সঙ্ঘের অফিসার ও কর্মীদের কিছু কিছু সামরিক শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো, তাঁদের পোষাকও হলো ফৌজের মতন।

নেতাজীর অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of Azad Hind Fauj)

জেনারেল ষ্টাফের কয়েকজন অফিসার—

১। মেজর জেনারেল জে. কে. ভোঁসলা : চিফ্-অফ্-ষ্টাফ্

২। কর্ণেল হাবিবুর রহমান : ডেপুটি চিফ্-অফ্-ষ্টাফ্

৩। কঃ আরসাদ :

৪। লেঃ কঃ গুপ্ত :

৫। কঃ টহল সিং : কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল

৬। কঃ পি. এন. দত্ত : ডেপুটি কিউ. এম. জি.

৭। কঃ থিমাইয়া : এ. কিউ. এম. জি.

৮। কঃ ভি. সি. নাগ : জাজ্ এড্ভোকেট জেনারেল এবং এ্যাড্জুটেণ্ট জেনারেল।

৯। কঃ সি. আই. ষ্ট্রেসি : কিউ. এম্. জি.

প্রথম ডিভিসন্ : ১৫,০০০ সৈনিক

মেজর জেনারেল এম্. জেড্. কিয়ানি—প্রথম ডিভিসনের কম্যাণ্ডার।

(১) সুভাষ ব্রিগেড্ :—১ম গরিলা রেজিমেণ্ট : ৩২,০০ সৈনিক
কম্যাণ্ডার : কঃ শাহ্ নওয়াজ খান—

(২) গান্ধীব্রিগেড্ : ২নং গরিলা রেজিমেণ্ট : ২৮,০০ সৈনিক
কম্যাণ্ডার : কঃ ইনায়েৎ কিয়ানি

(৩) আজাদ ব্রিগেড্ : ৩নং গরিলা রেজিমেণ্ট ২৮,০০ সৈনিক
কম্যাণ্ডার : কঃ গুলজারা সিং

(৪) নেহরু ব্রিগেড্ : ৪নং গরিলা রেজিমেণ্ট : ২৮,০০ সৈনিক
কম্যাণ্ডার : মেজর রাণা (পরে কঃ গুরুবক সিং ধিল্লন)

(৫) বাহাদুর গ্রুপ নং ১

উপরোক্ত ইউনিট্গুলি থেকে স্বতন্ত্র ; কম্যাণ্ডার : কঃ বুরহানুদ্দিন : সৈন্য সংখ্যা ১০০০-এর বেশি। এই ইউনিটের সৈন্যসংখ্যার নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা ছিল না। কেননা যুদ্ধের প্রয়োজনের তাগিদেই এর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হ'তো। এই গ্রুপের আগে নাম ছিলো 'এস্. এস্. গ্রুপ'। নেতাজী এ নাম বদলে 'বাহাদুর গ্রুপ' রাখেন।

(৬) ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ

কম্যাণ্ডার : কঃ এস. এ. মালিক, সরদার এ. জংগ।

(৭) ফিল্ড ফোর্স।

২য় ডিভিসন : ১৫,০০০ সৈন্যসংখ্যা

কঃ আজিজ আহমদ (পরে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খান্)

(১) **২নং বাহাদুর গ্রুপ—**

(২) ৫নং গরিলা রেজিমেণ্ট :
কম্যাণ্ডার : কঃ পি. কে. সাইগল

(৩) ১নং ইন্ফ্যান্ট্রি ব্রিগেড্

(৪) ২নং ইন্ফ্যান্ট্রি ব্রিগেড

(৫) ৩নং ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ব্রিগেড্

(৬) ৪নং ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ব্রিগেড্……ইত্যাদি

এর সংগেও স্বতন্ত্র ভাবে 'বাহাদুর গ্রুপ' ও 'ইন্‌টেলিজেন্স্ গ্রুপ' ছিলো।

৩নং ডিভিসন: ১৫,০০০ সৈন্য

কম্যাণ্ডার: কঃ নাগর।

এই ডিভিসনও ২য় ডিভিসনের ন্যায় কতকগুলো ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ব্রিগেড্, ফিল্ড ফোর্স ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয়েছিলো।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাসপাতাল বিভাগ

আজাদ হিন্দ ফৌজের ৪টি বড় হাসপাতাল ছিলো। প্রত্যেকটিতে প্রায় ৭০০ রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিলো। এ ছাড়া আরো অনেক ছোটখাটো হাসপাতাল ছিল।

মেজর জেনারেল এ. ডি. লোগনাথন্ হলেন ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল সার্ভিস্। (কিছুদিনের জন্য কঃ এস. সি. আলাগাপ্পানও ডি. এম. এস. ছিলেন)।

কঃ কুলাবন্ত রায়: ডি. ডি. এম. এস. (কিছুদিনের জন্য কঃ খাসলিওয়ালাও ডি ডি. এম. এস. ছিলেন)।

কঃ পুরী: এ. ডি. এম এস.: প্রথম ডিভিসন্।

কঃ গোস্বামী: এ. ডি. এম. এস: দ্বিতীয় ডিভিসন্।

প্রথম হাসপাতাল মেয়াং (Myang) (রেঙ্গুনে)।

কমাণ্ডিং অফিসার—লেঃ কঃ জে. আর. সেনগুপ্ত।

দ্বিতীয় হাসপাতাল: বিদ্যাধরী (সিংগাপুরে)।

কমাণ্ডিং অফিসার—লেঃ কঃ আব্রাহাম্।

তৃতীয় হাসপাতাল : ম্যানেভা (Maneva) (বার্মা)।

কমাণ্ডিং অফিসার—কঃ মিশ্র।

চতুর্থ হাসপাতাল : মেমিও (Mamyo) (নর্থ বার্মা)।

কমাণ্ডিং অফিসার—লেঃ কঃ বাবা সিং (পরে লেঃ কঃ আহম্মদ)।

মিলিটারী পুলিস :

কমাণ্ডিং অফিসার—লেঃ. কঃ. আবদুল রসিদ (পরে যথাক্রমে লেঃ. কঃ. মানসিং, লেঃ. কঃ. রাতুড়ি)।

মিলিটারী পুলিশ অর্থাৎ সামরিক পুলিশ : কাজ হচ্ছে সৈনিকদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখা ও নাগরিকদের সৈনিকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা। এক কথায় সৈনিকদের নিয়মানুবর্তি রাখা।

বৃটিশ পরিত্যক্ত ভারতীয় সেনা এবং পূর্ব এশিয়ার বেসামরিক ভারতীয় অধিবাসীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হলো। কিঞ্চিদধিক ৫০,০০০ হাজার ফৌজের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ হাজার হচ্ছে সিংগাপুর ও অন্যান্য স্থানের ব্রিটিশ পরিত্যক্ত সেনা—বাকি বেসামরিক অধিবাসী। এই ৩০,০০০ হাজারের মধ্যে অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতীয় বা মাদ্রাজবাসী।

ফৌজের উচ্চতম অফিসার থেকে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সব ভারতীয় ;—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি সর্বজাতীয়। সংখ্যানুপাতে মুসলমান অফিসারদের সংখ্যা বেশি। বড় বড় অফিসার প্রায়ই ছিলেন মুসলমান।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শিক্ষা :—

ভারতীয়দের দ্বারাই ফৌজের সর্বপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যাধরী ও সালিতার (সিংগাপুরে) : বাতুপাহাত, সেরাম্বান,

কোয়ালালামপুর, পিনাং (মালয়ে) ; মিংলাডোন, থিনানযো, গোশালা ইনসিন্ (ব্রহ্মে); থাইল্যাণ্ডে একটা—ইত্যাদি প্রায় এগারোটি শিক্ষা-শিবিরে ফৌজের সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

সিংগাপুর ও রেঙ্গুনে ২টি অফিসার ট্রেনিং স্কুল ছিলো। ঐ স্কুলে ৬ মাস করে ট্রেনিং দেওয়া হতো। ৬ মাস ট্রেনিং নেবার পর পরীক্ষায় পাশ করলে ২য় লেফ্‌টেন্যাণ্ট হওয়া যেতো। বৃটিশ ভারতে ঐ সময় ৪ মাসে অফিসার হতো।

…সমর-কৌশল সাধারণতঃ বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের মতনই—তবে তার সঙ্গে জার্মানি ও জাপানী রণ-কৌশলও শেখানো হতো। কেননা সম্পূর্ণ আধুনিক সমরশিক্ষা দেওয়াই ছিলো নেতাজীর ইচ্ছে।

অস্ত্রশস্ত্র :—

বৃটিশ বাহিনী রিট্রিট (Retreat) করবার সময় বা জাপানীর কাছে আত্মসমর্পণ করবার পর যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিলো তা সবই আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে আসে। জাপানীরাও কিছু অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য হিসেবে দেয়—অবশ্য উহার পরিবর্তে দাম হিসেবে নেতাজী জাপান-সরকারকে অর্থ দেন। রাইফেল, পিস্তল, টমিগান্, বি. বি. গান, মেসিন গান, ব্রেন গান, মর্টার কামান, এ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফট্ … ইত্যাদি সব রকম অস্ত্রই আমাদের ছিলো।

খাবার :—

আজাদ হিন্দ-সরকারের খাবার বা রসদ প্রধানতঃ পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্য থেকেই সংগৃহীত। প্রয়োজনে জাপানীদের কাছ থেকেও দাম দিয়ে কেনা হ'ত। রসদ সরবরাহ করবার জন্যে দু রকমের সরবরাহ বিভাগ ছিল। প্রথম বিভাগটি—আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত।

এই বিভাগটি পূর্ব-এশিয়ার বে-সামরিক অধিবাসীদের মধ্যে থেকে রসদ সংগ্রহ ক'র্তেন। দ্বিতীয় বিভাগটি—সামরিক সরবরাহ বিভাগ (Military Supply Department)। সামরিক সরবরাহ বিভাগের কাজ ছিল সমস্ত ইউনিটগুলির মধ্যে রসদ ভাগ ক'রে দেওয়া।

খাবারের নিয়ম :—

শিক্ষা-শিবিরে এবং অন্যান্য স্থানে (যুদ্ধক্ষেত্রে নয়) সকালে রুটি (মকাই, আটা বা চালের) বা ছোলাভাজা, মুড়িমুড়কি, সঙ্গে গুড় ও চা। দুপুরে সাধারণতঃ ভাত (কখনো কখনো রুটি), ডাল ও একটি তরকারী। বৈকালে চা, রাত্রে ভাত (কখনো কখনো রুটি) মাছ, একটা তরকারী। মালয়ে আমাদের ক্যাম্পে আমরা সকালে রুটি, মুগের সঙ্গে ডিম মিশানো একটা তরকারী ও চা পাই। দুপুরে ভাত, ডাল, একটা তরকারী, কিছু ফল (যেমন কলা, পেঁপে), দুপুরের পর চা। আর রাত্রে ভাত, মাছ, তরকারী।

হাসপাতালের খাবার :—

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাসপাতালে রোগীদের যে খাবার দেওয়া হ'ত, তা বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যের হাসপাতাল থেকে অনেক ভালো।

প্রত্যেক রুগীকে রুটি, খিচুড়ি, ডিম্, দুধ, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরকারী দেওয়া হ'ত। বিশেষ ক্ষেত্রে পাউরুটী; মাখন, চিনি, দুধ, কলা, আনারস, ন্যাসপাতি ইত্যাদি।

পোষাক :—

বৃটিশ বাহিনীর আত্মসমর্পিত পোষাক জাপানীদের কাছ থেকে নেতাজী কিনে নেন। আমাদের পরণে তাই খাকি প্যাণ্ট, গায়ে খাকির জামা, পায়ে বুট, মাথায় সাধারণ খাকির টুপী। টুপীর

বামপাশে ভারতের মানচিত্র আঁকা একটা ব্যাজ্। বুকের ডানদিকে একটা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আঁকা ব্যাজ্। নেতাজী থেকে সুরু করে নিম্নতম সেবক সেবিকা পর্যন্ত সকলেরি ওই একই পোষাক। তবে শিখদের মাথায় থাকে পাগড়ী।

সামরিক পদচিহ্ন :—

আমাদের সামরিক পদচিহ্ন পৃথিবীর অন্যান্য ফৌজদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

মেজর জেনারেল :—কাঁধের ওপর তিনদিকে সোনালী ধারী লাগানো একটা চওড়া খাকি ফিতের ওপর একজোড়া সোনালী কাঁচির মতন চিহ্ন।

কর্ণেল :—সোনালী ধারী লাগানো খাকি ফিতের ওপর সিকি ইঞ্চি পরিমিত ৩ টি সোনালী রঙের ফিতে ও একটি সোনালী তারা।

লেঃ কর্ণেল :—কর্ণেলের মতনই, খালি সোনালী ফিতে দুটো।

মেজর :—লেঃ কঃ এর মতন, খালি সোণালী ফিতে একটা।

ক্যাপটেন্ :—লালধারী দেওয়া খাকি ফিতের ওপর সিকি ইঞ্চি পরিমিত ৩ টি নীল ফিতে।

লেফ্টেন্যাণ্ট :—ক্যাপ্টেনের অনুরূপ, কিন্তু একটা ফিতে কম।

২য় লেফ্টেন্যাণ্ট :—লেফ্টেন্যাণ্টের মতন—একটা ফিতে কম।

সাব অফিসার :—খাকি চওড়া ফিতের উপর তিন দিকে লাল ধারী।

হাবিলদার :—দক্ষিণ বাহুর উপর সিকি ইঞ্চি পরিমিত চওড়া ও প্রায় ২½ ইঞ্চি পরিমিত লম্বা তিনটি সাদা ফিতে।

নায়ক :—হাবিলদারের মতন, কিন্তু একটা ফিতে কম।

ল্যান্স্ নায়ক :—নায়কের মতন, এক ফিতে কম।

সেবক বা সিপাহী :—কোন চিহ্ন নেই।

ফৌজের সর্বোচ্চতম পদ—ফিল্ড মার্শাল। জেনারেল ও ফিল্ড মার্শাল পদে কেহ প্রমোশন পান নি।

নেতাজীর কোন র‍্যাঙ্ক বা পদচিহ্ন নেই। তাঁর বুকের ওপর ডান দিকে একটি তিন রঙের জাতীয় পতাকার গোল ব্যাজ, বাঁদিকে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের চিহ্ন নির্দেশক একটি ছোট ক্রশ্। মাথার টুপীর বাঁদিকে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকা ব্যাজ। এ ছাড়া তিনি অন্য কোন চিহ্ন ধারণ করতেন না।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পকেট খরচা :—

মোহন সিং যখন জি. ও. সি. ছিলেন—

লেঃ কর্ণেল	...	১৭৫	ডলার
মেজর	...	১২০	,,
ক্যাপ্টেন	...	৮০	,,
লেফ্টেন্যাণ্ট	...	৬০	,,
২য় লেফ্টেন্যাণ্ট	...	৫০	,,
সাব্ অফিসার (১ম শ্রেণী)	...	৪৫	,,
সাব্ অফিসার (২য় শ্রেণী)	...	৩৫	,,
হাবিলদার	...	১৪	,,
নায়ক	...	১১	,,
ল্যান্স্ নায়ক	...	১০	,,
সেবক বা সিপাহী	...	৯	,,

সিঙ্গাপুরের ১ ডলার সমান ভারতের ১৷৵০ আনা।

নেতাজীর সময় অফিসারদের পকেট খরচ মাত্র একবার বাড়ে;

কিন্তু হাবিলদার থেকে সেবক পর্যন্ত ক্রমেই বাড়তে থাকে; এবং নেতাজীর ইচ্ছা ছিল ওদেশেই সেবকের পকেট খরচা ৫০৲ টাকা করা। কিন্তু অফিসারদের দেশে আসবার পূর্বে আর বাড়বে না।

এখানে ভারতীয় জাতীয় সৈনিকের পকেট খরচার একটা চিত্র দেওয়া গেল:—

মেজর জেনারেল	..	টাকা ৩৫০৲ থেকে ৪০০৲ (সম্ভবত)
কর্ণেল	.	,, ২৯৫৲
লেঃ কর্ণেল	.	,, ২৩০৲
মেজর	.	,, ১৭৫৲
ক্যাপ্টেন	.	,, ১৩০৲
লেফ্টেন্যাণ্ট	.	,, ১০০৲
২য় লেফ্টেন্যাণ্ট	.	,, ৮০৲
সাব অফিসার	.	,, ৭০৲
হাবিলদার	.	,, ৩৬+৪=৪০৲
নায়ক	.	,, ৩২+৪=৩৬৲
ল্যান্স্ নায়ক	.	,, ২৮+৪=৩২৲
সেবক বা সিপাহী	.	,, ২৬+৪=৩০৲

প্রত্যেক অফিসার ও সৈন্যদের এ বাদে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা হ'তো। উদ্দেশ্য তাঁরা ভারতে পৌছোলে ওই টাকা দেওয়া হবে। রেঙ্গুনে আত্ম-সমর্পনের সময় সব টাকা দেওয়া হয়।

আজাদ হিন্দ্ দল:—

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর আদেশে তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা, সম্ভবমত ভালো আহার

ও পোষাকের ব্যবস্থা করা হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ভারত আক্রমণের তোড়জোড়ও চলতে লাগলো। অন্যদিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দ্বারা অধিকৃত এলাকা সুশাসনের বন্দোবস্ত করবার কথাও নেতাজী ভুলে যান নি। তাই তিনি অধিকৃত এলাকায়—তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সুশাসন প্রবর্তিত করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

পূর্ব এশিয়ার অসামরিক অধিবাসীদের ভেতর থেকে বিভিন্ন রকমের লোক নিয়ে আজাদ হিন্দ্ দল গঠন করলেন। এ দলের কাজ ঠিক হলো—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কোন স্থান অধিকার করলে—সেখানে গিয়ে সুশাসনের ব্যবস্থা করা।

আজাদ হিন্দ্ দলের সকলেরই ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। Civil Administration Training Institute খোলা হলো—Civil Administrator দলকে শিক্ষা দেবার জন্য। ইন্টারভিউ করে এখানে লোক নেওয়া সুরু হলো। ৬ মাস ট্রেনিং। ট্রেনিংয়ের পর পরীক্ষায় পাশ করলে তবে ঐ কাজের যোগ্য বলে বিবেচিত হ'বে। এঁদের কিছু কিছু সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হবে। এই দলের দুটো ভাগ—(১) Administrator Class I, এবং (২) Administrator Class II.

আজাদ হিন্দ্ দল যদিও আধা সামরিক সঙ্ঘ, তবুও তাঁদের সামরিক অফিসাদের মতন পদ-চিহ্ন ও নাম ছিলো। তিনদিকে লাল ধারী দেওয়া ফিতের ওপর নীলরঙের সিকি ইঞ্চি চওড়া ফিতে। কাঁধের দুদিকেহ এই পদ-চিহ্ন তাঁরা লাগান। দুইদলের Administrator-কেই বলা হতো দলপতি। এঁদের নীচে যে সব অফিসার থাকতেন তাঁদের বলা হতো জঠাদার। এঁদের কাঁধে থাকে তিনদিকে লাল ধারী লাগানো একটা ফিতে।

জঠাদারদের নীচের র‍্যাঙ্ক থাকলো—টুলিপতি, টুলিদার, সেবক। আজাদ হিন্দ্ দলের অধিনায়ক হলেন আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের লোকসংগ্রহের মন্ত্রি কর্ণেল ঈশান কাদির (Manpower Minister).

এঁদের মাইনে হলো যথাক্রমে—Administrator প্রথম শ্রেণী—১৮০৲ টাকা; দ্বিতীয়শ্রেণী—১৫০৲ টাকা; জঠাদার—৭০৲ টাকা; টুলিপতি ৫০৲ টাকা; টুলিদার—৩৫৲ টাকা; সেবক - ২৫৲ টাকা।

এই বিভাগটির কাজ মেজর জেনারেল এ.সি. চাটার্জীর উপদেশ মত চলতো!

ঝাঁসি বাহিনী :—

গত ২২ শে অক্টোবর শোনানে নেতাজী ঝাঁসি বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেছেন। ২২শে অক্টোবর করবার কারণ—১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিনায়িকা ঝাঁসির রাণীর জন্মদিন ২২শে অক্টোবর।

১৯৪৩ সালের সেই দিনে বেলা পাঁচটার সময় নেতাজী ঝাঁসি বাহিনীর শিক্ষা শিবিরে এলে, শোনানের মহিলা প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী শ্রীমতী চিদাম্বরী নেতাজীকে সম্বর্ধনা করেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন ও তাঁর বাহিনী সামরিক রীতিতে নেতাজীকে অভিবাদন জানালেন। পরে তাঁরা উভয়ে নারীবাহিনী পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধন বক্তৃতায় নেতাজী বলেন যে—'আন্দোলনের অগ্রগতির পথে ঝাঁসির রাণী বাহিণীর শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন এক স্মরণীয় কাহিনী। রাজনৈতিক আন্দোলনই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সর্বদিক থেকে জাতির পুনর্জীবনের মহান কার্যের ভার নিয়েছি আমরা। আমরা আনবো নতুন যুগ। ভারতের ঐতিহ্য থেকে প্রমাণ হয় যে, আমাদের অতীত

গৌরবের প্রাচীন ভারতের মহিয়সী নারী মৈত্রেয়ী, মহারাষ্ট্রদেশের অহল্যাবাই, স্বলতানা রিজিয়া, রাণী ভবানী, নুরজাহান, ঝাঁসির রাণী —এঁদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই আমাদের অতীত প্রমাণ করে।...’ নেতাজী বিশ্বাস করেন—বর্তমান ভারতেও এমন নারীর অভ্যুদয় সম্ভব। একথা ঠিক, ঝাঁসির বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু এ পরাজয় একা ঝাঁসির রাণীর নয়, এ পরাজয় সমস্ত ভারতের। ঝাঁসির রাণীর কোনোদিন মৃত্যু হতে পারে না; তাঁর আত্মা অমর। সে অমর আত্মার আদর্শে আবার ঝাঁসির রাণী জন্মাবেন এই ভারতে, আর আমরা হবো জয়যুক্ত...

লক্ষ্মী স্বামীনাথনের পূর্ব-পরিচয়

মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবারে এঁর জন্ম হয়। বর্তমানে সেণ্ট্রাল এসেম্ব্লির মেম্বর মিসেস আম্মা স্বামীনাথন তাঁর মা। সেখানকার এক ব্যারিষ্টারের মেয়ে ইনি। সম্ভ্রান্ত বংশ। আশৈশব ইনি যত্নে এবং বিলাস-বাহুল্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন।...মাদ্রাজ থেকে লক্ষ্মী স্বামীনাথন এম.বি., বি. এস. পাশ করেন। ডাক্তার হবার কিছুকাল পরে ইনি সিঙ্গাপুরে চলে এসে ডাক্তারী আরম্ভ করেন। তাঁর প্রাকৃটিস্ ভালোই হতো।

পারসী ভাষায় একটা কবিতা আছে, যার মানে হচ্ছে বসন্তকালের ফুলের মধ্যে শুয়ে থাকার মতন জীবন—অর্থাৎ বিলাস-বাহুল্য ভরা নির্বিঘ্ন জীবন। শুনেছি লক্ষ্মী স্বামীনাথনের দিনও কাটতো বসন্ত-কালের ফুলের মধ্যে শুয়ে। আর এখন—? এখন তিনি একজন কঠিন কর্তব্যপরায়ণ সৈনিক। বহুমুখী কল্পনা থেকে এসেছেন কঠিন মাটিতে।

প্রয়োজনে যাতে যুদ্ধে যেতে পারে সে রকম ভাবেই এই বাহিনীকে শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে। ঝাঁসির রাণী বাহিনীকে রেজিমেণ্ট ও সেবা বিভাগ—এই দুই ভাগে ভাগ করা হলো। রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে ট্রেনিং সেণ্টার খুলে রীতিমত সমস্ত রকমের অস্ত্রের শিক্ষা এই বাহিনীকে দেওয়া হচ্ছে।

(৬)

২৩শে অক্টোবরে (১৯৪৩) ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হ'য়েছে। জাপানী গভর্ণমেণ্ট অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকার ক'রেছেন, এবং এই সরকারকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন।

ঐ দিনই রাত্রি ১১টা বেজে ৫৫ মিনিটে বেতার যোগে আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে নেতাজী গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

এতোদিনের নির্যাতিত নিপীড়িত ভারতবাসী, সে দিন যেন আবার তার শতাব্দী সঞ্চিত সমস্ত জড়ত্ব দূর ক'রে, গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো। যে ভারতবর্ষ জগতের চোখের সামনে হেয়, হীন, অসভ্য, অর্ধ-বর্বর রূপে চিত্রিত হ'য়ে আসছিলো, যে ভারতবর্ষ অক্ষম পঙ্গু ভিক্ষুকের মতন এতোদিন বার বার গলবস্ত্র ও জোড়হাতে স্বাধীনতা চেয়েও পায় নি, উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদীর কুটিল চক্রে নাগ পাশের মতন ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়েছে—সেই পরাধীন, পঙ্গু ভারতবর্ষ এতোদিন পরে জেগে উঠলো তার সম্মোহনের নিদ্রা থেকে। Independence is

impossible without bloodshed! রক্ত না দিলে স্বাধীনতা আসে না। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতকে লক্ষ লক্ষ জীবনের মূল্য দিয়ে আনতে হ'য়েছে স্বাধীনতা। ভারতবর্ষ ইতিহাসের সেই চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার ক'রে এতোদিন ভুগেছে, যক্ষ্মা রুগীর মতন দিন দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে এসেছে।···ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের ভুল। আর নেতাজী? নেতাজীই আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন পৌরুষ—। ক্লীবত্বের অসীম লজ্জা থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। হাত ধরে টেনে এনেছেন বাস্তবের রুক্ষতায়—। যেখানে সমস্ত স্বার্থান্বেষীর স্বার্থচক্র ধরা পড়ে গেছে! পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেছি, বুঝতে সক্ষম হয়েছি, ভিক্ষে নয়, দাবীর জোরে ছিনিয়ে নিতে হ'বে নিজের পাওনা।

নেতাজী যখন পাডাংএর মিউনিসিপাল্ বিল্ডিংএর এক বিরাট জনসভার কাছে এই যুদ্ধ-ঘোষণার সংবাদ জানালেন—সমস্ত জনতা তখন তাদের দেহের সমস্ত উত্তেজনা নিয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তারা আনন্দে বার বার জয়ধ্বনি ক'রতে থাকলো। সমস্ত জনতা হাত তুলে নেতাজীর এ যুদ্ধ ঘোষণাতে তাদের অন্তরের সমর্থন জানালো। তারা দু' হাত তুলে এগিয়ে আসতে থাকে, যেন সেই মুহূর্তেই সকলে দিল্লী যাবার জন্য প্রস্তুত।

পৃথিবীর যে আটটি গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নেন:—

জাপানী গভর্ণমেণ্ট:—২৩শে অক্টোবর, জাপান গভর্ণমেণ্ট অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার ক'রে নেন।

স্বাধীন ব্রহ্মদেশ:—২৩শে অক্টোবরে স্বাধীন ব্রহ্মদেশও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করেন।

স্বাধীন ফিলিপাইন :—উক্ত দিনে এঁরাও স্বীকার করেন।

জার্মান গভর্ণমেণ্ট :—২৬শে অক্টোবর, জার্মান পররাষ্ট্র সচীব হের ভন্ রিবেন্‌ট্রপ সরকারী ভাবে এক খবর পাঠান—'রাইখ গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার ক'রছেন—'।

(৭)

বাতুপাহাত (মালয়ে) :—২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ—

বাতুপাহাত ক্যাম্পে আমরা তখন ট্রেনিং নিচ্ছি। নেতাজী এলেন আমাদের ক্যাম্পে। বেশির ভাগ সৈন্যই নেতাজীকে এই প্রথম দেখলেন। এতোদিন নেতাজী সম্বন্ধে তাঁদের মনে যে কৌতূহল ও শ্রদ্ধা সঞ্চিত হ'চ্ছিলো, নেতাজীকে দেখার পর তা আরো বেড়ে গেলো।

২৮শে অক্টোবর :—এই দিনে আমরা বাতুপাহাত থেকে রেঙ্গুনাভিমুখে রওনা হলাম। ৩০শে এলাম বাটারওয়ার্থে। ..১লা নভেম্বর এলাম পেনাংএ ; সেইদিনই যসিতামারু (S. S. Yositamaru) নামের একখানা জাপানী জাহাজে আমরা ব্রহ্মদেশাভিমুখে রওনা হলাম।

....সন্ধ্যার একটু আগে জাহাজ ছাড়লো। মার্তাবান উপসাগর (Bay of Martaban) হ'য়ে চললো জাহাজ।···সময়টা বোধহয় শুক্ল পক্ষই হ'বে ; চাঁদের আলো ঝরে পড়তো সমুদ্রে, আমরা ডেকে দাঁড়িয়ে দেখতাম, গান গাইতাম···কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে তর্ক জুড়তাম। বেশ কাটছিলো সমুদ্রযাত্রা। যাত্রার তৃতীয় দিবসে হঠাৎ কম্যাণ্ডারের হুকুম হ'লো তৈরী হ'য়ে নেবার, অর্থাৎ লাইফ্ বেল্‌ট বেঁধে প্রস্তুত হবার। সে সময় আমাদের

কম্যাণ্ডার কর্ণেল বুরহানউদ্দিন। তিনি বললেন যে, যদি জাহাজ ডুবে যায়, তা হলে যেন আমরা সবাই জাহাজ ডুবে যাওয়ার পূর্বেই জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাপিয়ে প'ড়ে অন্ততঃ ২।৩ শত গজ দূরে চ'লে যাই, তা না হ'লে জাহাজের সঙ্গে আমাদেরও সলিল সমাধি লাভ হ'তে পারে।… আমাদের সঙ্গে আরো ৪টি জাহাজ ছিলো। হঠাৎ সব কটিই ফিরে গেলো সেই পথে, যে পথ দিয়ে তারা এগিয়ে এসেছিলো। এমনি ক'রে ৩।৪ ঘণ্টা কেটে গেলো। আবার সকলে ফিরে ব্রহ্ম দেশাভিমুখে চলতে লাগলো।…পরের দিন শুনতে পেলুম যে, শত্রুর ডুবো জাহাজের খবর পাওয়া গিয়েছিলো। অবশ্য আমরাও এরকম কিছু একটা বিপদের অনুমান করেছিলাম।

সেইদিন বিকেল থেকেই আমাদের সাহায্যের জন্য জাপানী বিমান রেঙ্গুন থেকে আসতে লাগলো…!

এমনি ভাবে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এসে পৌছোলাম রেঙ্গুনে।

রেঙ্গুন বিয়াল্লিশ সালের মার্চ মাসে জাপানীদের হাতে আসে।

…আমরা যখন রেঙ্গুনে পৌছোলাম, তখন রেঙ্গুনের অবস্থা দেখলে অনুকম্পা হয়। রেঙ্গুন হার্বারের কাছাকাছি প্রায় সমস্ত বড় বড় গুদোম ও দালান ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে। জাপানী প্লেন যতো না এই ধ্বংসের কারণ, তার চেয়ে বেশি বৃটিশ ও আমেরিকান প্লেন। মিত্রপক্ষের বিমান তখন ঘন ঘন আক্রমণ স্বুরু ক'রেছে।

১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট ব্রহ্মদেশ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে—অর্থাৎ আমরা যাওয়ার অনেক আগেই।

এ সময়—রেঙ্গুনে থাকবার সময় ওদেশীয় লোকদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত যে ধারণা জন্মেছে তা বিশেষ ভালো নয়। শিক্ষার দিক থেকে ওরা মোটেই উন্নত নয়। মেয়ে এবং পুরুষ উভয়েরই

নৈতিক জীবন ভাল নয়। অবশ্য সামান্য কিছু শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক যে আছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।...এ দেশীয় জনসাধারণের চরিত্র সম্বন্ধে ভালো ধারণা কি ক'রে করা সম্ভব? তারা স্বাধীন হ'য়ে নিজেদের জাতীয় সৈন্য বাহিনী গড়বার সুযোগ পেয়েও তার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতে পারে নি? এ থেকে তাদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা বা জাতীয়তাবাদের বালাই আছে বলে মনে হয় না। এদের অর্থাৎ বর্মীদের যিনি কম্যাণ্ডার তাঁর নাম আউঙ্গ সেন (Aung Sain)। এঁর চরিত্র বা রাজনীতি বোঝা কঠিন।...জাপানীরা যখন ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ক'রলো, ইনি ব্যাঙ্ককে গিয়ে জাপানীদের ডেকে আনলেন। আর যখন তিনি স্বাধীন বর্মা গভর্ণমেণ্টের সেনাপতি, তখন তাঁর মতিগতি দেখলে সন্দেহ হয়—ইংরেজদের প্রতি বুঝি তাঁর কিছু দুর্বলতা আছে।

মিত্রপক্ষীয় বিমান আক্রমণে রেঙ্গুন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। এখানকার সোয়েডন প্যাগোডা, রেলওয়ে স্টেসন্, ইন্সিন্ স্টেসন্, ইন্সিন্ কারখানা, মিয়াংয়ের পাগলা হাসপাতাল, হার্বার, বহুগ্রাম ও সহরের নানা জায়গা একেবারে ধ্বংস হ'য়ে গেছে ...।

বর্মিরা অত্যন্ত অত্যাচারী জাত। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি ইংরেজরা ব্রহ্মদেশ ছেড়ে আসার পর এবং জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করবার সময় এরা ভারতীয়দের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছিলো। তাতে তারা স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বালিকা রাখে নি।

ব্রহ্মদেশীয় জাতীয় পোষাক দেখেছি লুঙ্গি, জামা ও মাথায় রুমাল বাঁধা।

এখানে খাবার দাবার একরকম সবই পাওয়া যায়। শুনেছি নাপ পি (মাছ পচান একরকম খাবার) জিনিসটা খেতে বেশ উপাদেয়।....

৫ই ও ৬ই নভেম্বর টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার নেতৃবর্গের এক

সম্মেলন হ'য়ে গেলো। এই সভায় নেতাজী দর্শক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বা মাও, থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জোসে পি. লরেল, নানাকিন গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়াং চিয়াং ওয়ে, মাঞ্চুকু গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী চিয়াং চিয়াং ওই, ইঁহারা সকলে উপস্থিত ছিলেন।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো ভারতীয়দের এ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'জাপান ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্ব রকম সাহায্য করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাপানের আন্তরিক ইচ্ছে যে, ভারতীয়গণ তাঁদের লক্ষ্যে পৌছাবার জন্যে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেদের নিয়োজিত করুন।'

'জাপানী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের একটা চুক্তি হয়ে গেছে—পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সমস্ত সম্পত্তি আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে যাবে। আর এই চুক্তি অনুসারে ব্রহ্মদেশের 'জীয়া বাডী ষ্টেট্' আজাদ হিন্দ্ সরকারের অধীনে গেল।'

আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এই সর্ত অনুসারে আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের হাতে এলো।

আরও চুক্তি হলো যে, ভারত ভূমিতে অধিকৃত সমস্ত জায়গা আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হবে। অধিকৃত এলাকার সমস্ত যুদ্ধ সম্ভার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাতে যাবে। তাতে জাপানী গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বা করবে না।

জাপানী ফৌজ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পরস্পরকে যথাযোগ্য সম্মান দেবে।

নেতাজী এ সভায় একটি বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরুদ্ধ হ'য়ে প্রায় ছ ঘণ্টা ব্যাপী এক ভাষণ দেন। এই ভাষণে নেতাজী পূর্ব এশিয়াবাসী প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন ও এশিয়াটিক জাতি সঙ্ঘের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এশিয়াটিক জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে মিশে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

নেতাজীর ব্যক্তিত্ব দেখে জাপানী বড় বড় অফিসারেরা বিস্মিত হয়ে বলতেন—'তোমাদের দেশে এতো বড় নেতা থাকতে কি করে তোমাদের দেশ পরাধীন থাকে। যদি আমাদের দেশে এই রকম নেতা থাকতেন আমরা আরো উন্নতি করতাম।'

৫টি প্রস্তাব এই সভায় নেওয়া হলো—

১। পূর্ব এশিয়ার জাতি সমূহের মধ্যে একে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। একে অন্যের Tradition মেনে চ'লবে।

২। পূর্ব এশিয়ার জাতি সমূহের মধ্যে একে অন্যের ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যের ধর্মকে যথাযোগ্য সম্মান করবে।

৩। এশিয়াবাসী জাতিদের নিয়ে একটি সঙ্ঘ গঠন করা হবে। এঁদের পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মৈত্রী থাকবে।

৪। সংস্কৃতির উন্নতির (Cultural Development) জন্য পরস্পরকে সাহায্য করবে।

৫। পূর্ব এশিয়ার জাতিরা উপরোক্ত ভাবে নিজেদের সর্বরকম উন্নতি সাধন করে পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত মানব জাতির নিরাপত্তার ও কল্যাণের জন্য সর্বরকম চেষ্টা করবে। *

* উপরোক্ত পাঁচটি পয়েন্ট স্মৃতি থেকে লেখা।

(৮)

কাগজে দেখলাম—এক জাপানী সাংবাদিক নেতাজীর ম্যানিলা যাওয়া সম্বন্ধে এক সুন্দর বিবরণ দিয়েছে।

টোকিও থেকে ফেরবার পথে নেতাজী ফিলিপাইনের অদ্বিতীয় দেশপ্রেমিক জোস রিজনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ম্যানিলায় নামেন।

ম্যানিলার লুনেটা পার্কে ফিলিপাইনের প্রসিদ্ধ দেশনেতা জোস রিজনের মর্মর মূর্তি স্থাপিত।

নেতাজী সেই মূর্তির গলায় শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ মালা দেন।

নেতাজীর মালা দেওয়া শেষ হলে ওখানকার ভারতীয়রা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ জয়ধ্বনিতে নিজেদের শ্রদ্ধা জানায়।

…৮ই নভেম্বর :—

২৩শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট হিসেবে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর অনেকগুলি স্বাধীন দেশই আজাদ হিন্দ্ সরকারকে মেনে নেয়।

সম্প্রতি কোরেশিয়া ও থাইল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করেছেন, এবং ভারতীয়দের সর্ব রকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

৮ই নভেম্বর ইটালী, চীনের নানকিং, মাঞ্চুকু গভর্ণমেণ্টও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আয়ার্লাণ্ডের গণতন্ত্রের কাছ থেকেও ঐ দিন নেতাজীর কাছে আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপক তার আসে।

এর কিছুদিন পরে স্পেন গভর্ণমেণ্টও আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপক তার পাঠায়।

রেঙ্গুনের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেমন একটা নেশা হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় শরৎ সাহিত্যের গোপন ক্রিয়া।

সেদিন এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ক্যালকাটা রোডে গিয়ে হাজির হ'লাম। একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেলো। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন পি. সরকার বলে। তাঁর ডান হাতটা একেবারে কাটা। শুনলাম একদা তিনি মান্দালয় জেলের জনৈক কর্মচারী ছিলেন। বোমার আঘাতে তাঁর ডান হাত নষ্ট হয়ে গেছে। ভদ্রলোক ভীষণ আলাপী, এবং চুরুট ভক্ত। আমার সঙ্গে আলাপ করেই টেনে নিয়ে চললেন তাঁর বাড়ী। ভীষণ আগ্রহ—আমার যুদ্ধ জীবনের গল্প শুনবেন। বিদেশে বাঙালী। তাঁর আগ্রহকে বোধ হয় সেই জন্য উড়িয়ে দিতে পারলাম না।... ক্যালকাটা রোডেই ছোট একটি বাড়ীতে তিনি থাকেন। সংসার বলতে একমাত্র মেয়ে। মিস্ সরকারের বয়স হবে বোধ হয় বাইশ। তিনি কোন এক ফার্মে চাকরি করেন।

মিঃ সরকারের ঘরে গিয়ে বসলাম। মিস্ সরকার এলেন। আর এলো অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা। ভাবলাম প্রবাসে বাঙালীরা তো মন্দ নয়—অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে স্বজাতি-প্রীতি আছে।

গল্প সুরু হলো ··

মিস্ সরকার প্রশ্ন করলেন—'আপনি তো তাহলে অনেকদিন হলো এ দিকে রয়েছেন—!'

'হ্যাঁ, তা প্রায় দু'বছর হ'তে চললো। বিয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে এসেছি, আর এটা হলো তেতাল্লিশের নভেম্বর—'

'মিঃ বোস, আপনি কি নেতাজী আসবার আগেই আই. এন. এ. তে যোগ দিয়েছিলেন?' মিঃ সরকার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, আমি আই. এন. এ. তে গোড়া থেকেই যুক্ত। বিয়াল্লিশের ২৭শে অক্টোবর আমি আই. এন এ. তে যোগ দিই—। সে দিনগুলো ভাবতে এখনো ভালো লাগে —। সে সময় যা কেটেছে—'

'খুব কষ্টে বুঝি—?

'শুধু কষ্টে নয় নানা ভাবে —। যুদ্ধবন্দী—আই. এন. এ. সৈনিক··· কতো ভাবেই না দিন কাটিয়েছি আর কাটাচ্ছি।'

পিতা পুত্রীতে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কৌতূহল আর তাঁরা রোধ করতে পারলেন না।

'বলুন না—আপনার যুদ্ধ বন্দী জীবনের কাহিনী—'

'সে যে অনেক বড়—'

'তা হোক ছোট করে বলুন—'

অতএব বলতে হলো—

"সালিতার ক্যাম্পে জাপানী যুদ্ধবন্দী হিসেবে থাকি। দিন কাটে গতানুগতিক ভাবে —।

'সেই সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়া। তারপর আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টার মতন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ্।

'কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর আবার কাজের মধ্যে গলা বাড়ানো। যুদ্ধবন্দীদের ভেতর যার যে রকম কাজ পড়তো করতে হতো। আমি ছিলাম হাসপাতালের লোক। হাসপাতালেই কাজ করি। অন্যান্যরা বেরিয়ে পড়তো তাদের কাজে। কোথায় বোমায় বিধ্বস্ত হ'য়েছে একটা সহর, নষ্ট হয়ে গেছে রেল লাইন্, ফ্যাক্টরী গেছে চুরমার হ'য়ে। যারা দূরে যাবে তারা দুপুরের খাওয়া সঙ্গে করে বেরিয়ে যেতো।

সৌভাগ্যের বিষয় আমাকে আর ছুটোছুটি ক'রতে হ'তো না। ন'টা আন্দাজ হাসপাতালে যেতাম। আর বারোটা, একটা নাগাদ ফিরে আসতাম। ফিরে এসে খাওয়া, বিশ্রাম। জ্বালানী কাঠ আমাদের নিজেদেরই তৈরী ক'রে নিতে হ'তো।

'ক্যাম্পের ঘেরা তারের বাইরে বাজার বসতো। মালয়ী, চৈনিক, ভারতীয় কতরকমের পসারীরা আসতো। আলু, বেগুন, কুমড়ো, লাউ, শাক, কলা, পেঁপে, ম্যাংগোষ্টীন নামে এক রকম ডুমুরের মতন ফল। আমরা কিন্তু অবাক হতাম তিনপয়সায় যখন একটা বড় আনারস দিতো। বেশ সস্তা সব। হাঁস, মুরগী কতো কি? সেই বাজারে সব পাওয়া যেতো—তেঁতুল লঙ্কা থেকে সুরু ক'রে—দুধ ঘি পর্যন্ত। 'ডুরিয়ান' খেতে অনেকটা আমাদের কাঁঠালের মতন।···আমাদের যা দরকার তারের বেড়ার মধ্যে থেকে কিনে নিতাম।···অবাক হবেন না—আমরা যুদ্ধবন্দী হ'লেও কিছু কিছু হাত খরচা পেতাম।··তবে সে হাত খরচাটার বেশির ভাগই সিগারেট কিনতে খরচ হ'য়ে যেত। এক এক প্যাকেট ন আনা, দশ আনা। বড্ড চড়া। তা হোক তবু তো সিগারেটটা মাঝে মাঝে পাওয়া যেতো। যাক সে কথা। সারাদিন কাজকর্মের পর বিকেলে সব ক্যাম্পে ফিরতাম। সেখানে 'রোলকল' হতো। তার-পর খাওয়া দাওয়া সেরে ক্যাম্প কম্‌পাউণ্ডের মধ্যে গল্প করতাম। কেউ কেউ গান গাইতো, কেউবা খেলতো তাস। ··অনেকে নিজের ধর্মমতে উপাসনা করতো।···বুঝতেই পারছেন এসময়টা ছিলো আমাদের লিজার টাইম—তাই যার যা খুসি সে তাই ক'রে সময় কাটাতো। ··

'এমনি ভাবে দিন কাটতো।···সেই সময় আই. এন. এ. র তাড়া সুরু হ'য়েছে। আই. এন. এ. তে যোগ দেবার জন্যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা

নিয়ে অপেক্ষা ক'রছিলাম।···দিন ব'য়ে যায়।—অপেক্ষায় দিন কাটে, কোনো সাড়া শব্দ পাই না।

'···নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে মনের উত্তেজনা প্রকাশ করি, আর অপেক্ষায় দিন গুনি। অবশেষে কেমন যেন একটা অভিমান জেগে উঠতে লাগলো। কেনোই বা জাগবে না। বাস্তবিক আমরা মনে প্রাণে আই. এন. এ.-র সমর্থক। নিজেদের জীবনের প্রতি রক্ত-বিন্দু দেশের স্বাধীনতার জন্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। স্বাধীনতাকামী সৈনিক হিসেবে আমাদের আন্তরিকতায় কে সন্দেহ করতে পারে? ঠিক কোরলাম—না ডাকা পর্যন্ত ওপথে আর এগুবো না—যাবো না।

'ঈশ্বরের অসীম কৃপা—শেষ পর্যন্ত ডাক এলো। ডাক এলো—২৭শে অক্টোবর তারিখে।

'সকালের দিকে বেলা তখন আটটা ন'টা হবে—একজন রিক্রুটিং অফিসার এসে জানতে চাইলেন আমাদের মধ্যে কে কে আই. এন. এ.তে নাম লেখাতে চায়। সৌভাগ্যের বিষয় ঠিক আমারই সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রিক্রুটিং অফিসার। সবার আগেই আমি চট করে আমার হাত তুলে বললাম—'আমি'। সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশে থেকে হাত উঠতে লাগলো। 'আমি' 'আমি'। 'আমির' একটা কোলাহল জেগে উঠলো। বহু প্রত্যাশিতের এই আকস্মিক আবির্ভাব—তাই বোধ হয় এ উন্মত্ততা।

'রিক্রুটিং অফিসারটি হাসলেন। ব'ললেন—'সৈনিক সুলভ ডিসি-প্লিন্ রাখবার চেষ্টা কর।'

'মুহূর্তে সকলে হাত নামিয়ে নিলো। গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেলো। এক এক করে নাম লেখা সুরু হলো।

'সবার আগেই আমার পালা।

'নাম ?'

'নিতাইলাল বসু।'

'কোন্ কোরে ছিলে ?'

'হস্পিটাল কোরে'।

'কবে বন্দী হয়েছিলে ?'

'ফেব্রুয়ারীতে'।

'তুমি বাঙালী' ?

'হ্যাঁ!' দৃঢ় কণ্ঠে জানালাম।

'আই. এন্. এ.তে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ?' অফিসার প্রশ্ন করলেন।

'সম্পূর্ণ'।

'আচ্ছা। বাইরে অপেক্ষা ক'র।'

'Next man······? (আর কে ?')

'···সেই দিনই আমাদের ডাক্তারী পরীক্ষা হ'য়ে গেলো।

'···তারপর সেখান থেকে চ'লে গেলাম নিস্যুন. ক্যাম্পে। নিস্যুন ক্যাম্পে থাকতো নব গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। নিস্যুন ক্যাম্পটা সালিতার ক্যাম্প থেকে প্রায় সাত আট মাইল দূর হবে।

(৯)

'···নিস্যুন ক্যাম্পেই জায়গা পেলাম। দুঃখের বিষয় এ ক্যাম্পে আমার পূর্বপরিচিত সাথী কেউ থাকলো না—একজন বাদে।

'প্রথম দিন অতো কিছু লক্ষ্য করে দেখলাম না। মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিলো—সারাদিনের ঘটনাগুলো। রাত্রে শুতে গিয়ে বার বার মনে পড়তে লাগলো—আই. এন্. এ.তে যোগ দিয়েছি—

'ভাবতে ভাবতে রাত্রি গভীর হয়ে এলো। সারা ক্যাম্প ভরে নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে গেলো। নতুন জায়গা, নতুন রাত্রিবাসের স্থান—তারপর ভবিষ্যতের কল্পনা। কি আমায় করতে হবে? না জানি কবে বেয়নেটের ধারালো খোঁচায় বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে হবে রক্ত বিনিময়!

'আমার পুরাণো সাথীটি কিন্তু আমার মতন জেগে নেই। সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। অদ্ভুত ছেলে। কোথাও কোনো ঘটনাই কি ওকে খুব গভীর ভাবে চঞ্চল করতে পারে না?

'পুরাণো বন্ধুদের কথা মনে পড়লো; কে জানে ওরা এখন কোথায়? নতুন দিনের সূত্রপাত হলো। আবার আসবে নতুন বন্ধু....তারা ধীরে ধীরে হবে পরিচিত, ঘনিষ্ঠ। তবু যারা পুরাণো, তাদের তো বাদ দিতে পারি না। তারা যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। দুর্বলতা আমাদের জন্য নয়। সমস্ত দুর্বলতা জয় করে শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম—তারা যেন সত্যিকার মুক্তিকামী ভারতের সৈনিক, এ সত্য যেন প্রমাণিত হয়!

'ধীরে ধীরে নিস্যুন ক্যাম্পের জীবনে অভ্যস্থ হয়ে আসতে লাগলাম। নিস্যুন ক্যাম্পের ব্যারাক্ দেখে চমকে উঠতে হয়। যুদ্ধ ব্যারাক সম্বন্ধে এতোদিন যে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা ছিলো তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।...দুটো ব্যারাক্। ব্যারাক দুটো মস্তবড় তেতলা বিল্ডিং। শুনেছি আগে নাকি এ ব্যারাকগুলোর নাম ছিলো মীরাট ও পাঞ্জাব ব্যারাক। ব্রিটিশ অফিসারেরা সব থাকতেন সবচেয়ে ভালো দোতলা বাড়ীটিতে। এখন এ সব ব্যারাকগুলোর নাম বদলে দেওয়া হ'য়েছে। তাদের নাম হয়েছে যথাক্রমে—'গান্ধী ব্যারাক', 'আজাদ ব্যারাক', 'নেহেরু ব্যারাক্'......।

'আমি জায়গা পেলাম রয়াল আর্টিলারি বিল্‌ডিংএ—সর্বোৎকৃষ্টটিতে, যেখানে আগে বৃটিশ অফিসারেরা থাকতেন। ভাগ্যের কি খেলা? সাদা চামড়ার আবাসস্থানে কালো চামড়া? যদি তাঁরা থাকতেন, আমার এ দম্ভ কি সহ্য করতে পারতেন?

'আমাদের গ্রুপটির নাম ছিলো 'এস. এস. গ্রুপ'। ক্যাম্পটিও এস, এস. ক্যাম্প নামে পরিচিত ছিলো।

'...এখানে একটা কথা বলা দরকার। আমি আর তখন হস্‌পিট্যাল্‌ কোরে নেই; আর ক্লার্কও নই। আমি তখন রেগুলার রেজিমেণ্টের লোক—একজন পূর্ণ সৈনিক।...যা বলছিলাম... ক্যাম্পের কথা। 'এস. এস. ক্যাম্পের' ঘরগুলো বেশ বড় বড়। প্রত্যেক ঘরে জলের কলের আধুনিক ট্যাপ্‌, ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা। এক এক ঘরে মাত্র পাঁচ ছ জন থাকে।

'...নিস্যুনে আমাদের দিন কাটছিলো মন্দ নয়। হঠাৎ নভেম্বর মাসে আই. এন্‌. এ. তে ভাঙন ধরলো। সে একটা মস্ত বিশৃঙ্খলা। মোহন সিং, আর রাসবিহারী বসুর মধ্যে মনোমালিন্য। মোহন সিং গ্রেপ্তার ইত্যাদি অনেক ব্যাপারই ঘটে গেলো। আমরা সন্দেহ এবং আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলাম। এসে পড়লো তে-তাল্লিশের এপ্রিল। নিস্যুন থেকে চলে গেলাম বাতুপাহাতে—মালয়ে। সেখানে ট্রেনিং নি, আর কবে যুদ্ধে যাবো তাই ভাবি।

'শেষ পর্যন্ত আবার সব ঠিক হয়ে গেল। তেতাল্লিশের জুলাইতে নেতাজী এলেন সিঙ্গাপুরে। আই. এন. এ.-র নবজীবন সুরু হলো।

'বাতুপাহাতে থাকি অক্টোবর পর্যন্ত, তারপর এখন তো দেখছেনই রেঙ্গুনে।'

আমার গল্প শুনে ওঁরা নির্বাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

একটু পরে মিস্ সরকার জিজ্ঞাসা করলেন। মিঃ বোস! 'জয়-হিন্দ' কথাটির প্রচার হলো কি করে?

'ও! ওর কারণ বুঝি জানেন না মিস্ সরকার? তবে শুনুন—'ভারতবর্ষে বহু ভাষা ও বহু জাতি বর্তমান। প্রত্যেক জাতিই বিভিন্ন কায়দায় অভিবাদন করতে অভ্যস্ত। যেমন মুসলমান্ বলে—'সেলাম আলেকুম', শিখ বলে—'সৎ শ্রী আকাল', মাদ্রাজী হিন্দু বলে—'নমস্কারম্,' ইউ. পি.-র লোক বলে—'জয় রামজী', 'নমস্তে', বাঙালী বলে—'নমস্কার,' পাঠান বলে—'স্তেড়ে মুষে', ইত্যাদি। জানেন তো আজ আমাদের সর্বতোভাবে এক হওয়ার প্রয়োজন। তাই নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও সরকারের লোকদের আদেশ করলেন—'জয়হিন্দ', (অর্থাৎ ভারতের জয় হোক) বলে একে অন্যকে অভিবাদন করতে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান্ প্রভৃতি সকলে এটা মেনে নিলো: কারণ এতে বিশেষ কোন জাতির স্বার্থ রইল না। তাই দেখতে পাচ্ছেন—আজ সমস্ত পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসী এই কথাটা গ্রহণ করেছেন।

'আচ্ছা আপানাদের মাথার টুপিতে 'ইত্তিফাক' (Ittifaque), 'ইত্‌মাদ' (Itmad) এবং 'কুরবাণী' (Kurbani) বলে যে তিনটি কথা লেখা আছে ওর অর্থ কি?'

"আমাদের জাতীয় পতাকা সবুজ. সাদা ও গৈরিক তিনটি রঙ্গে রঞ্জিত। সবুজটির অর্থ 'ইত্তিফাক' অর্থাৎ 'একতা'; সাদাটির অর্থ 'ইত্‌মাদ' অর্থাৎ 'ভরসা' এবং গৈরীকটির অর্থ বলিদান'। এই তিনটি কথা আমাদের মূলমন্ত্র। তাই আমাদের টুপির ব্যাজেও এই কথাগুলি লেখা হয়েছে।'

এই পর্যন্ত আমাদের ঐ দিনকার গল্প শেষ হলো। আমি ওঁদের 'জয় হিন্দ' বলে বিদায় নিলাম।

(১০)

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি :—

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছিলো ভারত আক্রমণের জন্য তোড় জোড় চলছে।

...১২ই ডিসেম্বর আমাদের বাহাদুর দলের অধিনায়ক কর্ণেল বুরহানউদ্দিনের কাছে আদেশ এলো—ভারত অভিযানে সর্বপ্রথম আমাদেরই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।...অনেক ভাগ্যে এমন আদেশ আসে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সর্বপ্রথম অনুমতি লাভ কম গৌরবের কথা নয়! এ ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। মাতৃভূমির বন্ধন মুক্তি সংগ্রামের প্রথম সৈনিক দল হতে পারা যে কী গৌরব, আর তৃপ্তির জিনিস—তা আমরা ছাড়া আর কেউ বোধ হয় বুঝবে না।

খবর যখন ছড়িয়ে পড়লো—আমরা সকলেই উত্তেজনায় এবং উল্লাসে ভ'রে উঠলাম।

...একটি দল পাঠাবার ব্যবস্থা হ'তে লাগলো।

...আজাদ হিন্দ ফৌজের 'বাহাদুর দল' এবং ইন্‌টেলিজেন্স দল এই দুই দল থেকে বাছাই ক'রে একটি বাহিনী তৈরী হ'লো। কর্ণেল সৈকত আলী মালীক সরদার-ই-জঙ্গ হলেন এর অধিনায়ক। ইম্ফল অভিমুখে এঁদের যাত্রা সুরু হ'লো।

বাহাদুর দলের আর একটি বাহিনী কর্ণেল এল. এস. মিশ্র—সরদার-ই (E)-জঙ্গের অধিনায়কত্বে আরাকান অভিমুখে যাত্রা সুরু করলো।

...মনে পড়ছে যখন এক একটা দল তৈরী হতে সুরু হলো,

তখন সকলেই সবার আগে যাবার জন্যে কী রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলো। সকলেই সবার আগে যেতে রাজী। কা'কে ছেড়ে যে কা'কে নেওয়া হবে সেইটেই হ'য়ে উঠলো মুশকিলের ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত অধিনায়কের হুকুম—যাঁর ওপর কোনো কথা বলা চলে না। তাঁরই হুকুম মতন বাছাই করে দল সৃষ্টি হলো। সৌভাগ্য বশতঃ আমি প্রথম দলে পড়লাম।

...প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে ১৩ই ডিসেম্বরের দুপুরের মধ্যে আমরা তৈরী হ'য়ে গেলাম।

...তখন বোধ হয় ১টা আন্দাজ হ'বে। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে আমরা তৈরী · পিঠে পিট্টু, কাঁধে বন্দুক, টমিগান...প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। ইন্‌টেলিজেন্স্ দলের লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো।

আমরা এসে দাঁড়ালাম কুচকাওয়াজ—প্যারেড্ মাঠে। . কিছুপরে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের ব্রহ্ম কম্যাণ্ডার নেতাজীর personal representative কর্ণেল S.C. Alagappan এলেন। তিনি আমাদের শেষ নির্দেশ দিলেন। Ceremonial parade-এর পর আমরা মার্চিং গান গাইলাম।

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা	এগিয়ে যা এগিয়ে যা
খুশীকে গীত্ গায়ে জা	খুনীর গীত গাইতে যা।
ইয়েহ্ জিন্দ্গী হ্যায় কৌম কী	দেশের তরে জীবন ধন
(তো) কৌম্ পৈ লুটায়ে যা॥	দেশের লাগি করবি নে পণ?
তু শেরে হিন্দ আগে বঢ়্	শেরে হিন্দ এগিয়ে যা
মরণেসে ফিরভি তু ন্ ডর	সামনে মরণ ফিরে না চা॥
আসমান্ তক উঠায়ে শির	আকাশ বিঁধে তুলবি শির
জোশে ও তন্ বঢ়ায়ে জা॥	দেশের জোশ বাড়াব বীর।

তেরে হিম্মত বঢ়তি রহে	বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তেরী স্থন্‌তা রহে	খুদা তোরে দেবেন জোর।
জো সামনে তেরে চড়ে	সামনে বাধা পরোয়া না কর
(তা) থাক্‌মে মিলায়ে জায় ॥	ধূলায় তারা পাবে যে গোর ॥
চ'লো দিল্লী পুকার কে	হুঙ্কারিয়া দিল্লী চল
কৌমী নিশান সম্ভাল্ কে	কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল
লাল কিল্লে গাড়কে	লাল কেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
লহ্ রায়ে জা লহ্ রায়ে জা ॥	এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল ॥
কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা	এগিয়ে যা, এগিয়ে যা ॥ *

রাত্রি প্রায় নটা হবে—। রেঙ্গুনের মিয়াং ক্যাম্প থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা তিনেক পরে এসে পৌছোলাম রেঙ্গুনের কুসিং স্কুল নামে—একটা স্কুলে।

কুসিং স্কুলে প্রায় একটা দিন কেটে গেলো। সেদিন রাত আর পরের দিন বিকেল পর্যন্ত সেইখানেই থাকলাম।...বিকেলে বাহাদুর দলের অধিনায়ক লেঃ কঃ বুরহানউদ্দিন অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আমাদের 'সি-অফ' করতে এলেন। ..তাঁর সে গাম্ভীর্য্য সে দিন আর নেই—পরিবর্তে কেমন যেন একটু হাল্কা ভাব। তিনি প্রত্যেকটি সৈনিকের সঙ্গে আলাপ করলেন। প্রত্যেককে তাদের 'র‍্যাঙ্ক' সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং শেষে করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানালেন।...এলো আমার পালা। এখানে একটু মজার ব্যাপার ঘটলো। হঠাৎ তিনি আমাকে এক 'র‍্যাঙ্ক' ওপরে প্রমোশন দিয়ে দিলেন। প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে বুঝলাম অবাক হবার তেমন কিছু নেই। ক্যাম্পে

* এই গানটির বাংলা-অনুবাদ 'দেশ' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

আমার কিছু সুনাম ছিলো। প্রমোশন হওয়া অনেক আগেই আমার উচিত ছিলো; কিন্তু আমার Company Commander-এর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় তা আটকে পড়েছিলো। কর্ণেল সাহেবের মুখোমুখি হতেই তাই প্রমোশনটি হ'য়ে গেলো।...করমর্দন শেষে কঃ বরহান-উদ্দিন আমাদের নানা উপদেশ দিলেন।...

বিকেল ছটা নাগাদ আমরা রেঙ্গুন স্টেশনে যাবার জন্যে কুসিং স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রেঙ্গুন স্টেশনে ট্রেনে ওঠবার পর থেকেই অবশ্য লেঃ কঃ এস. এ. মালিক হলেন আমাদের সম্মিলিত দলের কম্যাণ্ডার।

ষ্টেশনে কর্ণেল এস. সি. আলাগাপ্পা আবার আমাদের বিদায় দিতে এলেন। তখনকার পরিস্থিতিটুকু চমৎকার। আমরা এক নতুন উত্তেজনায় মসগুল হয়ে বসে রয়েছি। ঘন ঘন 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ', 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে স্টেশন মুখর হয়ে উঠেছে···সকলেই হাসিমুখে বিদায় জানাচ্ছে পরিচিত জনকে।··· একটু দূরে কর্ণেল দাঁড়িয়ে আমাদের এ উল্লাস উপভোগ করছেন, সমস্ত আত্মা দিয়ে। হয়তো ভাবছেন এরাই ভারতের সত্যিকার মুক্তিকামী বীর। নেতাজীর অপূর্ব সৃষ্টি।

···ট্রেন ছাড়লো। আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'দিল্লী চলো', 'নেতাজী জিন্দাবাদ'······। ট্রেনের চাকার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠের সুর মিলে রচনা হ'লো এক অনাগত সংগীত।

·· ট্রেন ছুটে চলেছে। কোথায় চলেছে জানি না—। কারণ গন্তব্য-স্থানের খবর একমাত্র কম্যাণ্ডার ছাড়া অন্য কাউকে জানানো হয় না।

....এই দিনটির সঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়তে লাগলো। প্রায় আড়াই বছর আগে এমনি ভাবে ট্রেনে আর একবার যাত্রা ক'রেছিলুম স্থরু। যে দিন নিজেকে পরিচয় দেবার একমাত্র সম্বল ছিলো বৃটিশ ভারতীয় সৈনিক বলে। বেকার জীবনের অসহ গ্লানিকে মন থেকে মুছে ফেলবার একমাত্র সেটাই ছিলো উপায়।... সেদিন দেশ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যোগদান করি নি।—কোনো আদর্শ, কোন মহৎ লক্ষ্য ছিলো না সে যাত্রার প্রচ্ছদপটে। তাই সেদিনের মনটা ছিলো ভীত, সংকুচিত, সন্দিগ্ধ। বার বার অতীতের পানে তাকিয়ে দুর্বল মনকে আরো দুর্বল ক'রে তুলেছিলাম। আর আজ—? আজো তেমনি শত শত সৈনিক সহযাত্রীর সঙ্গে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলেছি। কিন্তু সে দিনের মন আর আজকের মন কি এক! না—। এ দুই মনের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেদিনের ভীত মন আজ সাহসে ভরপুর। সংকুচিত বা সন্দিগ্ধ মন—আজ রোমাঞ্চিত, প্রসারিত।...আজ আমার কাছে বিরাট এক আদর্শ রয়েছে। সে আদর্শ মাতৃভূমির স্বাধীনতা। সে আদর্শ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবার গৌরব।...আমাদের মুখে তাই মলিনতা নেই—আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়।

১৫ই ডিসেম্বর ভোর হওয়ার পর আমাদের গাড়ী থেমে গেলো। কোনো রকম যান্ত্রিক গোলমালে যে গাড়ী থামলো, তা নয়। এমনিই প্রায় হয়। শত্রুপক্ষের বিমানের ভয়ে দিনের আলোয় ট্রেন বড় একটা চলতো না। রাতটুকু যতোটা পারা যায় এগিয়ে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন কোন এক স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হতো। এবারও তাই হ'লো।

বিমান আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—। আমরা দূর গ্রাম অঞ্চলে চলে গেলাম।

সে এক মজার ব্যাপার। এক একটা দলে ভাগ হয়ে পড়লাম। আট জন করে এক-একদলে। পদব্রজে যাত্রা সুরু করলাম। গা ঢাকা দিয়ে যাবার কোনো কারণ ঘটে নি। দিব্যি গল্প করতে করতে মাঠ ডিঙিয়ে, ঝোপ ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগলো। কিছু খাওয়ার দরকার। সকলেরই পকেটে পয়সা ছিলো। আর তার পরিমাণটা খুব যে কম—তা নয়।·· কি খাওয়া যাবে—এবং কোন জিনিসটা পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে খানিকটা মতভেদ ও রুচিভেদ হ'লো। শেষ পর্যন্ত ভোটে টিঁকলো মুরগীর মাংস, তরকারী, ভাত।...গ্রামের ভেতোর ঢুকে একে একে সব যোগাড় ক'রা গেলো। রাঁধবার বাসন আমাদের সঙ্গে ছিলো। আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট থেকে রাঁধবার বাসন দেওয়া হতো।

তারপর যে কাণ্ডটা ঘটলো, সেটা ঠিক ছেলে বেলায় বন্ধুবান্ধব মিলে বনভোজন করার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কেউ বসলাম উহুন ক'রতে, কেউ চ'ললাম কাঠ যোগাড় করতে, কেউ বা আবার মুরগী ছাড়াতে, তরকারী কাটতে। যাই হোক 'সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।'·· অতএব সবই একরকম হ'য়ে গেলো। স্নান সেরে এসে কলাপাতায় খেতে ব'সলাম।···

সারা দুপুরটা কাটলো। ধীরে ধীরে বিকেল হ'য়ে আসতে লাগলো। আমরাও স্টেসনাভিমুখে রওনা হয়ে পড়লুম। কেননা একটু অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছাড়বে আর সারা রাত প্রাণপণে চলবে ছুটে।

পরের দিনও ঠিক আগের দিনের মতনই কাটলো। সূর্যের আলো উঠতেই ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'লো। আমরা আগের দিনের মতন আট আটজনে দল বেঁধে গ্রামাঞ্চলে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

এই দিনে একটু ব্যাপার ঘটলো। আগের দিনের মুরগীর লোভটা ভুলতে পারি নি, তাই গ্রামে ঢোকবার আগে থেকেই মুরগী যোগাড়ের ফন্দী আটতে লাগলাম।...আর এমন কপাল, ঠিক গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝোপের আড়ালে দুটো জমকালো মুরগীর দেখা পেলাম। কেউ কোথাও নেই, সামনা সামনি কোনো বাড়ীও দেখছি না—কারই বা মুরগী! আমাদের মধ্যে একজন লোভ সামলাতে না পেরে মুখে মুরগীর সুন্দর আওয়াজ করতে লাগলো। একটু পরেই মোরগটা এসে হাজির। আর যেমনি আসা ঝোপের আড়াল থেকে মুরগী শব্দবিদ্ তাকে খপ্ করে ধরে ফেললো। সেটাকে আমাদের হাতে চালান করে, আবার সেই শব্দ। দ্বিতীয় মুরগীটি আসতে তাকেও পাকড়াও করা গেলো; এবং তারপর বিজয়গর্বে এগুতে লাগলাম। কিন্তু হায় কপাল—খানিকটা এগিয়েছি কী একেবারে হাতে হাতে 'ক্যাচ্'! কয়েকজন বর্মি ছোকরা আমাদের ঘেরাও ক'রলো। নেহাত কোর্তা আর অস্ত্রশস্ত্র দেখে হাতাহাতি ক'রতে সাহস ক'রলো না—নয়তো বুঝি সেটাও হ'তো। বুঝলাম তারা আমাদের মুরগী চোর বলে সন্দেহ ক'রেছে। এমন অপমান কেই বা সহ্য ক'রতে পারে। আমরা সদল বলে যার যেটুকু যে ভাষায় জ্ঞান আছে তা' দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম আমরা মুরগী চোর নই; তবে হ্যাঁ, মুরগীর মাংস আমাদের কাছে লোভনীয়। তারা কি আর বোঝে। বর্মিভাষায় হুমকি মারে। হয়তো চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার

করে—। এমন সময় আর একটি মাঝবয়সী বর্মি এসে হাজির হ'লো। আমরা বিস্মিত হলাম সে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে আমাদের প্রশ্ন করলো—আমরা কে? কোথা থেকে আসছি?···আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাকে বুঝোতে লাগলাম—আমাদের যাবতীয় পরিচয়। সে খুব মন দিয়ে আমাদের কথা শুনলো। মাঝে মাঝে বর্মি যুবকদের কী বোঝাতে লাগলো। ক্রমশ দেখলাম সেই বর্মিদলটির বিজাতীয় ভাব কেটে গেলো। তারপর যা হ'লো তা নিজেরাও প্রথম প্রথম বিশ্বাস ক'রতে পার্চ্ছিলাম না। মুরগী, দুধ, ফল, সব সেই বর্মিদলটি যোগাড় ক'রে দিলো। সে কী অতিথি সৎকারের আন্তরিকতা—। কোনোদিন তা ভুলবো না।···

ফেরার সময় যখন টাকা দিতে গেলাম, তারা কিছুতেই নিলো না। অগত্যা তাদের ছেলে মেয়েদের হাতে টাকা গুঁজে দিলাম। আসবার সময় সেই মাঝবয়সী বর্মিটি বললো—'বন্ধু, তোমাদের জয় ও জীবন কামনা করি...।'

আমরা তার সে অভিনন্দনের উত্তরে আমাদের প্রথায় তার দীর্ঘ জীবন ও তার প্রতি আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

(১১)

মান্দালয় :—

আজ ২২শে ডিসেম্বর (১৯৪৩)। মান্দালয় ফোর্টের কাছে আমাদের রেষ্ট্ ক্যাম্প্ (Rest Camp)···সেখানে ব'সে ডায়রী লিখছি।

আমরা মান্দালয় পৌঁছেছি ১৭ই তারিখে ভোরবেলায়। স্টেশন থেকে লরীতে ক্যাম্পে এসে হাজির হয়েছিলাম। সেদিন তেমন কিছু

উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। সকলেই কেমন যেন একটু ক্লান্তও ছিলাম। তাই সে দিন কোথাও না বেরিয়ে ক্যাম্পের মধ্যেই সারাটা দিন কাটিয়ে দিলাম।

১৮ই তারিখে মান্দালয় দেখতে বেরুবো ঠিক ক'রেও শেষ পর্যন্ত বেরুনো হ'লো না....ক্যাম্পেই আটকে পড়লাম। সে দিন আমাদের পুরো প্যারেড্ ইত্যাদি হ'লো। মন্দ কাটলো না দিনটা। খাবার দাবারের স্বব্যবস্থা ছিলো! তাজা সবজী, আলু, ভেড়ার মাংস, ফল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেল।

মুস্কিল হলো ১৯শে তারিখে। তখন রাত এগারোটা আন্দাজ হবে। হঠাৎ সকলকে সচকিত করে সাইরেন্ বেজে উঠলো। ধড় মড় করে উঠে সকলে ছুটলো ট্রেঞ্চের দিকে। সার্চলাইট গুলো জ্বলে উঠলো। সমস্ত কালো আকাশটাকে দিনের মত আলো ক'রে তির্যক গতিতে আকাশের কোণে খুঁজে বেড়াতে লাগলো শত্রুবিমান। গোঁ-গোঁ... কতকগুলো প্লেনের শব্দ। হ'য়তো শত্রুপক্ষের বিমান মাথার ওপর এসে পড়েছে। হয়তো জাপানী ফাইটার উঠেছে আকাশে..! অল্পক্ষণের মধ্যেই সুরু হ'লো বোমা বৃষ্টি।...কাছে দূরে ঘন ঘন বুক কাঁপানো শব্দ। পড়ছে বোমা—এ্যান্টী-এয়ারক্র্যাফট্ থেকে গোলা উঠছে আকাশে! ট্রেঞ্চে বসে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—তবু আন্দাজ করতে পা'রছি, বাইরে এক প্রলয় কাণ্ড ঘটছে! এমনি ভাবে প্রায় আট মিনিট কাটলো; তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে অল্ ক্লিয়ারের ঘোষণা পাওয়া গেলো। সবাই বেরিয়ে এলাম ট্রেঞ্চ থেকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের মধ্যে কেউ আহত হয় নি।

ব্রহ্মদেশের দুটি প্রধান সহর—রেঙ্গুন ও মান্দালয়। রেঙ্গুন হচ্ছে অনেকটা কসমোপলিটান্ সিটি—কলকাতার মতনই। মান্দালয় ঠিক তা নয়। সব রকমের লোক দেখা গেলেও বর্মি আভিজাত্যই এ সহরটির গর্ব। তা ছাড়া মান্দালয়ের অতীত ইতিহাসটাও স্মরণ করবার মতন। উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী, রেঙ্গুনের চেয়ে অনেক পুরাণো। সবার বড় জিনিস মান্দালয় ব্রহ্ম নৃপতিদের প্রধান নগর ছিল। দিল্লী বা আগ্রা যেমন ভারতবর্ষের মোগল রাজন্যবর্গের শতচিহ্ন আঁকড়ে পড়ে আছে, তেমনি হচ্ছে মান্দালয়। ব্রহ্ম নৃপতিদের বিলাস আর আভিজাত্যের অনেক স্মৃতি চিহ্নই এর আনাচে কানাচে ছড়ানো ছিল।

১৯৪৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর যে মান্দালয় দেখলাম, কে বলবে যে এই মান্দালয়ই অতীতের সেই মান্দালয়। অসম্ভব—তা কেহই বোধ করি বলবে না। কৈশোরে যে ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, প্রাণ রসে ভরপুর, জীবন্ত একটা সুর, তাকেই যদি কোন দিন দেখেন রোগগ্রস্ত, কংকালসার, মুমূর্ষ, আপনি বোধ করি কিছুতেই প্রথমে স্বীকার করতে চাইবেন না যে, এই মুমূর্ষ ব্যক্তিটি সেই যে একদা আপনার 'কৈশোর' নামক ছবির মডেল্ হতে পারতো। এই মান্দালয়ের ঠিক সেই অবস্থা। মান্দালয় আর মান্দালয় নেই, এখন তা একটা বিরাট ধ্বংস স্তূপে পরিণত হ'য়েছে।

আমরা যে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম...সেগুলো অধিকাংশই বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। কোথাও গভীর গর্ত হয়ে গেছে, কোথাও চাষ করা জমির মতন এবড়ো খেবড়ো হয়ে পড়ে আছে।.... এই রাস্তার দুপাশে ছিলো গগনচুম্বী প্রাসাদানুপম বাড়ী...এখন অনেক কষ্টেও একটা গোটা বাড়ী দেখা যায় না। অধিকাংশই ভগ্নস্তূপ হয়ে

বিরাজ করছে। লোকজন নেই—। বেশির ভাগই পালিয়েছে, যাদের নিতান্তই যাবার জায়গা ছিলো না, তারাই এখনো রয়েছে....।

এমন ভয়াবহ ধ্বংসরূপ আর কোথাও দেখি নি। সিঙ্গাপুর, মালয়, পিনাং সব সহরও তো দেখেছি—কিন্তু এমন জঘন্য রূপ—! না, অন্য কোথাও নয়।....কয়েকজন সে দেশীয় অধিবাসীকে প্রশ্ন করে জানলুম—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা মান্দালয় ছেড়ে চলে আসবার সময়—চীন ও ভারতীয় সৈন্যদের হুকুম দিয়ে আসে মান্দালয় ধ্বংস করে দেবার জন্যে। ভারতীয়দের কথা বাদই দিলাম—চীনেরাও অনেকটা তাই। স্বাধীন হয়েও এরা ইংরেজ ও আমেরিকার হাতের পুতুল।···যাই হোক এরা বেপরোয়া ভাবে ডিনামাইট, গান্‌কটন্‌, জালগিনেট্‌, গান-পাউডার প্রভৃতি হাই-এক্সপ্লোসিভ্‌, লো-এক্সপ্লোসিভ্‌ দিয়ে চোখে যা পড়েছে তাকে ধ্বংস করে শেষ করে দিয়েছে।···

···লোকে সৈনিক বলতে সব সময় কেমন একটা আতঙ্কিত হয়···। এর কারণ কি? একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, এ যাবৎ জগতে যত যুদ্ধই ঘটেছে তা একরকম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই নামান্তর। শক্তিবান চেয়েছে দুর্বলকে টুঁটি চেপে মারতে। আর সেই নিষ্ঠুর হত্যালীলার উপায় ও উপকরণ হয়েছে এই সৈনিক। এ যাবৎ তাই সৈনিক শুধু ধ্বংস করেই এসেছে, এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে তারই সঙ্গে জড়িত। ···নিজেও সৈনিক। তবে আজ আর সেজন্য লজ্জিত নই। কেননা আমি জানি আমার সৈনিকবৃত্তি অর্থলোভের দ্বারা পরিচালিত নয়। আমি সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচারকে সাহায্য করছি না—জয়যুক্ত হবার জন্যে। আমি ভারতের মুক্তি সাধক সেনা। মাতৃভূমির স্বাধীনতা, মানুষের শান্তি, এই আমার আদর্শ ও কাম্য। মনে পড়ে নেতাজীর কথা।—"India freed means humanity saved."

হঠাৎ সাইরেনের তীক্ষ্ণ চীৎকারে চমকে উঠলাম। দেখি সাইরেন বাজছে মান্দালয়ের বাতাস চিরে। মানুষ, পশু সব ছুটেছে ট্রেঞ্চের দিকে প্রাণ ভয়ে, মৃত্যু ভয়ে!...আমরাও ট্রেঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়লো মিত্রপক্ষীয় বি ২৯ বোমারু বিমান কতকগুলো। সেই পুরাণো ব্যাপার—। চোখ মন সব অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বোমার শব্দ, আগুন... এ্যান্টি-এয়ার ক্রাফটের গর্জন..., ফাইটারের ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন ক্ষ্যাপামি...,কতো আর দেখবো।... মিনিট কুড়ি পরে আবার বাজলো সাইরেন। ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাম্পের পথে পা বাড়ালাম।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি...

মান্দালয় থেকে বাইশে ডিসেম্বর আমরা আবার যাত্রা করলাম সুরু। ২৩শে তারিখে ইরাবতী নদী পার হয়ে অপর পারে সাগাইনে এসে পৌছালাম। সেই দিনেই রাত্রে শত্রু-বিমান আক্রমণ করলো বেপরোয়া ভাবে। দুটো ঘোড়া, আর একটা সিমের বীজের ষ্টোর গেলো পুড়ে...। অথচ প্রচারটা বোধ করি হলো তার শতগুণ।

....২৪শে তারিখে সন্ধ্যেতে আবার চড়লাম ট্রেনে। ভোর হবার আগে 'ইউ' নামক জায়গায় পৌঁছানো গেলো।

'ইউ' তে দিন চারেক আমাদের থাকতে হলো। এ সময় অনেক জাপানী সৈনিকদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। তারা প্রায় রোজই আসতো। গল্পগুজব করতো। আমরা কিছু খাবার উপহার দিলেই সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করতো।....এখানে জাপানীদের সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(১২)

এশিয়ার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে পা মিলিয়ে যদি কোনো জাত চ'লে থাকে তা হলে তা একমাত্র জাপানই। অথচো জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে মাত্র একটা দ্বীপ; যার আয়তন এবং লোকসংখ্যা এশিয়ার অনেক দেশ এবং জাতের কাছে একেবারে নগণ্য। তার সভ্যতার জন্মই বা ক'বছর! মাত্র অল্পকাল আগে—প্রকৃতপক্ষে একশতকও নয়। অবাক হতে হয়—সেই অর্ধবর্বর জাপান আজ কতো উন্নত এবং প্রগতিশীল।

জাপানীদের এটা হ'চ্ছে ২৬০৬ সাল। তাদের রাজার পূর্ব-পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সূর্য থেকে। তাই উদীয়মান সূর্যই তাদের জাতীয় পতাকা। সূর্য থেকে প্রথম যে রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম 'টেনোহিকা'। তাই তাদের সমস্ত রাজারা টেনোহিকা নামে পরিচিত। সাম্প্রতিক রাজা হিরোহিতো নামে পরিচিত হ'লেও বংশের নিয়মানুসারে তাঁরও নাম টেনোহিকা। ....এই রাজা সম্বন্ধে জাপানীদের অন্ধসংস্কার ও গোঁড়ামি সর্বজনবিদিত। তারা রাজাকে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। রাজার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানো নিষেধ, রাজার কোনো জিনিস পত্তর ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অবশ্য এর যেমন কুফল ফলেছে তেমনি একটা সুফলও আছে। সেটা হচ্ছে তাদের একতাবদ্ধতা। উল্টোদিকে অমন রাজতন্ত্র—বর্তমান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো সমস্যার সমাধান তো করতেই পারে না, উপরন্তু প্রতিবন্ধক।

···এখন কথা হ'চ্ছে গণতান্ত্রিক সামজ ব্যবস্থার আওতায় না থেকেও

তারা কতোটা প্রগতিশীল ও স্বচ্ছল জীবন যাত্রা নির্বাহ করছে এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখা যাক।

জাপানীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই শিক্ষিত। তাদের সাত বছরের ছেলে মেয়েরা সকলেই খবরের কাগজ পড়তে পারে।

বিমান জগতে তাদের কীর্তি আজ আর উপেক্ষা করা চলে না। তারা দাবী করে মেডিকেল সায়ান্সে তারা জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়। তারা ডাক্তারী শিখতে যায় জার্মানী, ব্যবসা বাণিজ্য শিখতে ইংলণ্ড বা আমেরিকায় যেখানেই সম্ভব সেখানেই দেখা যাবে তাদের। বিদেশে জ্ঞান আহরণ করে এসে তারা স্বদেশকে সমৃদ্ধ করে।...

জাপানী জাত কণামাত্র অলস নয়। সর্বদা কর্মব্যস্ত। একটা মজার কথা এ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা শয়নঘর পরিষ্কার ক'রে তালাবন্ধ করে দেয়, যাতে সারাদিনের মধ্যে আর কেউ ঘরে ঢুকে ঘুমোতে না পারে। ছেলে মেয়ে থেকে সুরু করে বুড়ো বুড়ি পর্যন্ত এ নিয়মের গণ্ডীতে আটকে পড়ে। কিন্তু এ নিয়ম বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। অলসতাই হচ্ছে মানুষের জীবনের কঠিন পাপ (নিজেদের জাতের দিকে তাকালে এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারি না)। সে পাপকে জাতির জীবন থেকে সমূলে ধ্বংস করবার এ প্রক্রিয়া অভিনব ও অনিন্দ্যনীয়।

জাপানী জাতির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ দেশভক্তি। তাদের আত্মঘাতি-দলের (সুইসাইড স্কোয়াডের) নাম কে না শুনেছে। এই স্কোয়াডটি জাপানী ভাষায় 'কামিকাজী' ব'লে পরিচিত। কামিকাজী দলের সৈনিকরা যুদ্ধযাত্রার পূর্বে নিজের আত্মীয় স্বজনদের সামনে নিজের শ্রাদ্ধ কার্য শেষ ক'রে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতো যুদ্ধে।... আর যুদ্ধে জাপানীরা কেউই বড় একটা বন্দী

হতে চাইতো না। বন্দী হওয়ার চেয়ে হারাকিরীকে (পেট চিরিয়া আত্মহত্যাকে) তারা অনেক সম্মানের বলেই মনে করে।

জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্যের বিচার—এ সবের বালাই নেই। ধর্ম্ম বলতে তাদের কাছে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে দেশ।...অবশ্য জাপানীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মালম্বীর সংখ্যা বেশি; এবং সেদিক থেকে ভারতীয় বৌদ্ধদের সঙ্গে তাদের মিল আছে। তাদের মন্দির, পূজা-পদ্ধতি অনেকটা ভারতীয়দের মতন, প্রণামটাও আমাদেরই মতন।

খাদ্য হিসেবে ভাতটা ওদের প্রধান খাদ্য। এই ভাত খেয়েই এই যুদ্ধে সকলকে তারা আতংকিত করে তুলেছে। অতএব আমরা দুর্বল—যেহেতু আমরা ভাত খাই, এ কথা মনে করবার যথার্থ কোনো কারণ নেই।

জাপানী জাতির শৃঙ্খলা (ডিসিপ্লিন) পৃথিবীর প্রত্যেক জাতের অনুকরণ-যোগ্য।...শেষ পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতায় এটুকু বলতে পারি জাপান জাতি হিসেবে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি। তারা শিশুর মত সরল আবার সাপের মত হিংস্র।

(১৩)

...শত্রুপক্ষীয় গতিবিধির জন্য দিনে কোন কিছু করা বা চলা কিছুতেই সম্ভব হয় না। সেইজন্য তিন দিন পরে আমরা 'ইউ' থেকে মোটর লরীতে চেপে যাত্রা করলাম। অগ্রসর হবার পক্ষে সন্ধ্যাই প্রশস্ত সময়—। আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। রবীন্দ্রনাথের "জয় যাত্রায় যাও গো" ঠিক সেই ধরণের যাত্রা আমাদের নয়, কারণ চারিদিক থেকে এল বাধাবিঘ্ন। আমাদের লরীগুলি চলেছে convoy

system-এ পর পর সারি সারি আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে। হঠাৎ শব্দ হ'ল—ঃ টা! টা!! টা!!! কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। চারিদিক থেকে মেশিনগানের গুলি বৃষ্টি হচ্ছে। যতই আমরা এগোই ততই আক্রমণের ভয় বাড়তে থাকে। আশ্চর্য! এরা দিন রাত জানে না, জানে শুধু আক্রমণ করতে, আর গুলি ছুঁড়তে। চারিদিক বারুদের ঘন অন্ধকারে ধূমায়িত বিশ্রী উৎকট গন্ধে দম্ বন্ধ হবার উপক্রম। আমাদের লরীগুলী সাবধানে এগিয়ে চলেছে—যতই আমরা এগোই ততই চারিদিক নির্জন নিঝুম হতে থাকে, মনে হয় যেন রূপকথার ঘুমন্তপুরী। মাঝে মাঝে এক এক বার পাহারাওয়ালার দর্শন মেলে। শীতের রাত—চারিদিকে ঘন বন —বহুবিধ রকমের গাছ—শাল, আমলকী, আম। এই গভীর বনের ভেতর দিয়ে হর্ণের বিকট শব্দ করতে করতে আমরা চলেছি।

সমস্ত রাত্রি চাঞ্চল্যকর উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে ভোরে আমরা চিন্দুইন্ নদীর তীরে অবস্থিত মোতায়েক ক্যাম্পে এলাম। অস্থায়ী সামরিক পর্ণকুটির—সারি সারি পাঁচ ছ'খানা ঘর। এখানে আমাদের একমাস থাকা স্থির হল। একমাস থাকা মানে বিশ্রাম তা নয়। বিশ্রাম আমাদের জন্য নয়। আমাদের এখানে গরিলা যুদ্ধ ও পাহাড়ী যুদ্ধের মহড়া চলতে লাগল। সেই ভোরে বন্দুক ঘাড়ে করে পাহাড়ী নদ, নদী, নালা, চড়াই অতিক্রম করে' পাহাড়ে চড়া অভ্যাস ক'রে জঙ্গল প্যারেড, পাহাড়ী প্যারেড প্রভৃতি সেরে যখন আমরা ক্যাম্পে ফিরতাম তখন রাত হয়ে যেত। ভয়ঙ্কর কষ্টকর জীবন। বোধ হয় এ পরিশ্রম মানুষে পারে না। কিন্তু দেহে ও মনে আস্‌ত অসম্ভব সাহস ও শক্তি যখন মনে করতাম আমি বাঙালী—বাঙালীর সন্তান আমি। সুদূর মাতৃভূমি ছেড়ে আজ এই পাহাড়ে দুঃসাধ্য তপস্যা

করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য। আমাদের দলের পাঞ্জাবী ও বাঙালী সকলেই জিজ্ঞাসা করত—"বোস, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা অভ্যাস নেই, বড় কষ্ট হয়—না?" হেসে বলি—"দেশের জন্য, দশের জন্য, এ কষ্ট আর এমন কি?" বলে ফেলেই আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।

রাত্রে ভীষণ শীত। একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে থাকতে হয়। সমস্ত রাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপি। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে রীতিমত কুইনাইন খেতে হয়। অনেকেই জ্বরে পড়তে লাগল। তা ছাড়া শুধু ভাত খাওয়া অভ্যাস করতে হয়। কারণ শত্রুর হাতে পড়লে আমাদিগকে চট্ করে কাহিল করতে না পারে।

মোতায়েক: জানুয়ারী, ১৯৪৪!—

মোতায়েক ক্যাম্পে গোটা জানুয়ারী মাসটা কাটাতে হবে ব'লে মনে হচ্ছে। নতুন বছর স্থরু হলো…আমাদেরও সৈনিক জীবনের নতুন পর্ব হয়েছে স্থরু।

…এ মাসে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে… আমরা তার সংবাদ পাচ্ছি সঠিক ভাবেই, তবে কিছু দেরীতে।

৭ই জানুয়ারী, আজাদ-হিন্দ্-সরকার, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ ও আজাদ-হিন্দ্-সংঘের সদর দপ্তর রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হয়েছে।… ব্রহ্মের ভারতবাসীরা এতে খুব আনন্দিত।…ব্রহ্মদেশের সর্বত্র আজাদ-হিন্দ্-সংঘের শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে ও দলে দলে ভারতীয়েরা আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ ও আজাদ-হিন্দ্-সংঘে যোগদান করছে।

১৫ই জানুয়ারী, নেতাজী মেজর জেনারেল এ. ডি. লোকনাথনকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চিফ্ কমিশনার নিযুক্ত করেছেন।

২৬শে জানুয়ারী: 'স্বাধীনতা দিবস'। পূর্ব এশিয়ার জনগণের মধ্যে 'স্বাধীনতা দিবস' সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হ'য়েছে।

...আমাদের ক্যাম্পে এক বাঙালী অফিসার এসেছেন। প্রয়োজনীয় কোন কাজে নিশ্চয়—তবে কাজ কী—তা জানি না। তাঁর কাছ থেকে আমরা রেঙ্গুনের গল্প শুনি—

...জাতীয় বাহিনীর জন্য নেতাজীর প্রয়োজন হ'য়েছিলো কম পক্ষে ন' কোটি টাকা।...অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে যাতে বোঝা যায় নেতাজী পূর্বএশিয়ার দীনদরিদ্র ব্যক্তির কাছেও আজ শুধু পরিচিত নন, অন্তরের দেবতা। সঙ্গে সঙ্গে এও বোঝা যায় বছরের পর বছর পরপদানত থেকে যে মর্মান্তিক জ্বালা ও অবমাননা এরা সহ্য করেছে, আজ সুযোগের মুহূর্তে সেই অপমান আর অমানুষিক ইতিহাসের রঙ্ তাদের মন থেকে, কর্ম্ম থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়।

গল্প শুনি—এক নাপিত তার বহু চেষ্টায় সঞ্চিত ক'য়েক শ টাকা এনে নেতাজীর নিকট তার প্রাণের আকুল বাসনা প্রকাশ করে—"নেতাজি,মেরা এতনাহি হ্যায়, আউর কুছ নেহি হ্যায়। ম্যায় ইস্‌কে বাদ আজাদ হিন্দ্ ফৌজমে কাম করনা চাতা হু!" নেতাজী বলেন—"নেহি নেহি ভাইয়া, তুম গরীব হো—ইয়ে তুমারা কিতনা তকলীব কা প্যায়সা—তুম্ ইয়ে ম্যাত দো। তুম্ থোড়া বহুত কাম্ করকে মদত ক'রো। ইয়ে রুপিয়া তুমারা মুসিবতকা দিনোমে কামমে আয়গা।" নাপিত বেচারা বড় দুঃখে বলে—"নেতাজী, ম্যায় সমজতাহুঁ মেরা দান বহুতহি থোড়ী হ্যায় ইস্‌লিয়ে আপ নেহি লেনা চাতা হ্যায়।" নেতাজী বাধ্য হ'য়ে তার দান গ্রহণ করেন ও বলেন, "নেহি ভাইয়া, তোমারা দান সাচমুচ বহুতহি বড়া হ্যায়।"

এইরকম ভাবে ধোপা, গোয়ালা অনেকেই তাদের অনেক কষ্টার্জিত সামান্য কিছু মূলধন যা ছিলো সব নেতাজীর কাছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে দান করতে আসে। এরকম দানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। নেতাজী তাই বলেন—'সত্যই গরীবদের দান ধনীদের দানের চেয়ে কত মর্মস্পর্শী।'

এসময় কতো বিভিন্ন রকমের লোক কতো বিভিন্ন রকমের দান যে করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একজন সিঙ্গাপুরবাসী নেতাজীকে একটি স্বর্ণনির্মিত চরকা দান করেন। নেতাজীর গলার মালা (যা সভা সমিতিতে নেতাজীর গলায় পরিয়ে দেওয়া হ'তো এবং যা নেতাজীর গলায় দেবার আগে নিতান্ত সাধারণ ছিলো) লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রী হতো।

একদিন এই রকম এক সভায় তিনি বক্তৃতা শেষে সাহায্য ভাণ্ডারের জন্যে তাঁর গলার মালাটি বিক্রী করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। প্রথম ডাকেই মালার দাম উঠলো এক লক্ষ টাকা। ক্রমে দাম বেড়ে চলে—এক-দুই-তিন-পাচ লক্ষ টাকা। যিনি সর্ব প্রথমে ডেকেছিলেন তিনি একজন পাঞ্জাবী যুবক। যুবকটি পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত ডাকলো। কিন্তু মালার দাম উঠলো সাত লক্ষ টাকা। তখন যুবকটি অধীর হ'য়ে মঞ্চের ওপর ছুটে এসে বললো - "আমি আমার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত দিয়েছি…।" নেতাজী যুবকটিকে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—'তোমার মত স্বদেশ প্রেমিকই এ মালার যোগ্যপাত্র, এ মালা তোমার…।' যুবকটি উত্তেজিত ভাবে মালাটি দুই হাতে বুকে চেপে অশ্রুসজল কণ্ঠে বললো—'এখন আর আমার ধন-সম্পদ কিছুই নেই, আমি ফৌজে যোগদান করতে চাই। দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ ক'রলাম।'

রেঙ্গুনের হাব্বি নামক এক মুসলমান ভদ্রলোক আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের জন্যে এক কোটি টাকা দান ক'রলেন। শ্রীমতী বেতাই ও শ্রীযুক্ত বি. ঘোষ উভয়েই তাঁদের ক'য়েক লক্ষ টাকার সমস্ত সম্পত্তি আজাদ হিন্দ্ সরকারের জন্যে দান করেন। নেতাজী মিঃ হাব্বি ও শ্রীযুক্ত বি. ঘোষকে 'সেবক-এ-হিন্দ' নামক পদক—অর্থাৎ 'ভারতীয় শ্রেষ্ঠসেবক' পদক দানে সম্মানিত করেন। শ্রীমতী বেতাইকে 'সেবিকা হিন্দ্' পদক প্রদান করা হয়। এই টাকায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য, 'নেতাজী ফণ্ড' খোলা হয়।

মিঃ হাব্বি একবার রেঙ্গুনে এক সভায় নেতাজীর গলার মালা ১২ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন।

ভারতীয়দের এই নিঃস্বার্থ দানের সহায়তায় এমনি ভাবে আজাদ হিন্দ্ সরকারের তহবিলে অর্থ বৃদ্ধি ঘটতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রায় ২০ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হন।

ঐ সমস্ত টাকা দিয়ে পূর্ব এশিয়ার বহু বড় বড় সহরে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক খোলা হয়। যেমন—সিঙ্গাপুরে, কোয়ালালামপুরে, পিনাঙে, রেঙ্গুনে ইত্যাদি। এক রেঙ্গুনেই ছিল ৩টি ব্যাঙ্ক। রেঙ্গুনের একটি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন শ্রীযুত দীননাথ। ১৯৪৪ সালের ৩১শে জুলাই ঐ ব্যাঙ্কে ছিল ১,৫৪,৫০,১৪৪।৵০।

(১৪)

ফেব্রুয়ারী ২ তারিখ আমাদের স্মরণীয় দিন। এইবার আর এক রকম বৈচিত্র্য আমাদের জীবনে এল। এতদিন আমরা চলেছি ট্রেনে, কখনও বা চলেছি মোটরে কখনও বা লরীতে। কিন্তু এইবার আমাদের 'পায়ে হাঁটা পথ' আরম্ভ হ'ল। আমরা আরও এগিয়ে চল্লাম। পরিধানে প্যাণ্ট, সার্ট, টুপি, বুট, কাঁধে বন্দুক, পিঠে ব্যাগ, কোমরে পিস্তল, টমীগান প্রভৃতি সৈনিক বেশে সজ্জিত হয়ে আমরা চলেছি—শুধু চলেছি। সন্ধ্যার সময় চলতে আরম্ভ করলাম। চারিদিক অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে হাওয়ার সন্ সন্ শব্দে বুক কেঁপে ওঠে....কিন্তু সব অগ্রাহ্য ক'রে আমরা সারারাত চল্লাম! ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, চিন্তা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই—শুধু চলেছি।

....ভোর হবার কিছু পূর্বে প্রায় শেষ রাতের শেষ প্রহরে চিন্দুইন নদীর পাড়ে ক্যালেবা নামক এক ঘাঁটিতে এসে আশ্রয় নিলাম। সাময়িক "পথ চলা" বন্ধ হ'ল। আমাদের বাহিনী সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর ফৌজ আমরা নই। তাই আমরা সকলে একসঙ্গে রাঁধতাম, একসঙ্গে খেতাম, আমাদের ভিতর ছোট বড়র কোন পার্থক্য ছিল না। শত্রুর মাঝখানে আমরা এসে পড়েছি। সমস্তক্ষণ শত্রুভয়। তাই ভোর হবার আগে এবং সন্ধ্যার পর আমাদের রান্নার হাঙ্গামা চুকিয়ে নিতে হতো। পূর্বেই বলেছি শেষ রাত্রে পৌছে আমরা ভোরের পূর্বে আমাদের রান্না মানে কিছু সিদ্ধ করে নিয়ে সমস্ত দিন বিশ্রাম নিতাম।

সন্ধ্যার সময় আবার পায়ে হাঁটা পথ আরম্ভ হ'ল। কিছু দূর

এগিয়ে 'চিন্দুইন্' নদী পার হতে গিয়ে বিমান আক্রমণের সঙ্কেত হ'ল। দেখতে দেখতে শত্রু বিমান এসে পড়ল। বোমা বর্ষণ হতে লাগল। দুম্ দাম্ পটাশ—কান যাবার যোগাড়। যাঁরা ডাঙ্গায় ছিলেন তাঁরা মাটিতে শুয়ে position নিলেন, আমরা ছিলাম নৌকায়। বিপদ আমাদের ; এই সময় ভয় পাওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা বেঁচে গেলাম। চিন্দুইন পার হ'য়ে এবার আমরা দু ভাগে বিভক্ত হ'লাম। এক ভাগ রওনা হ'ল চিন্দুইন নদীর ধার দিয়ে মোতায়েক হয়ে ইম্ফল (Imphal)-এর অভিমুখে, আর আমরা রওনা হ'লাম 'ক্যালেমিয়ো' অভিমুখে। পথ চলার সময় যখন আমরা যা শাক-সবজী পাই তাই সিদ্ধ করে খাই, কখনও বা বরাতে মুরগীও জুটে যায়। ডিম সিদ্ধও পাওয়া যায়। এই ভাবে আমরা বনভোজনের পর্ব আরম্ভ করি—মনে হয় চড়ুইভাতী করছি।

দিনটা সঠিক মনে পড়ছে না—খুব সম্ভবত—৬ই কি ৭ই ফেব্রুয়ারী হবে। আমরা ক্যালেমিয়োতে এসে পৌছলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্যালেমিয়োতে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভব করা যায়। চারিদিকে ছোট্ট ছোট্ট পাহাড় শ্রেণী থাকে থাকে সাজানো আর মাঝখানে এই গ্রাম। এক সময়ে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে ধান, চাল, শস্যাদি হত, এবং এখানকার বাসিন্দারা প্রকৃত পক্ষে কৃষিকার্য করেই জীবন যাপন করত। অধিকাংশ বাসিন্দাদেরই গরু আছে। যুদ্ধের জন্য যেমন সমগ্র জগতে একটা পরিবর্তন এসেছে, তা পরিবর্তনের ঢেউ থেকে ক্যালেমিয়োও বাদ যায় নি। কৃত্রিম যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে খর্ব করেছে। পাকা বাড়ী নেই বল্লেই হয়। ছোট্ট গ্রাম হলেও বেশ ঘন বসতি। অধিকাংশই অনুন্নত শ্রেণীর লোক। এরা না বর্মী না হিন্দু। এদেরই সংমিশ্রণ। যুদ্ধের দরুণ ভারতবর্ষের

মত এখানেও কিছু পাওয়া যায় না। বস্ত্রাভাব, অন্নাভাব। বস্ত্রাভাবে গায়ে কাপড় দেবার মত কিছুই নেই, এমন কি একখানি ছোট শাড়ীর অভাবে অনেক গৃহস্থ রমণী বাড়ীর বাহির হতে পারছে না। আমাদের দলের একটি অফিসার সেইদিন কথায় কথায় আমায় বল্লেন যে, তাঁহারই পরিচিত হিন্দুস্থানী রমণী কাপড়ের অভাবে ঘর থেকে বার হতে পাচ্ছেন না। আমার একটি লুঙ্গি ছিল। সেইটা সেই হিন্দুস্থানী রমণীকে দিলাম। তাঁর স্বামী লুঙ্গিখানি পেয়ে কি খুশী! যেন চাঁদ হাতে পেয়েছেন।

আমরা প্রথম দিকে আশ্রয় পেয়েছিলাম টিনের ঘরে। কিন্তু ঘন ঘন বোমা বর্ষণের জন্য ও আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বেত-ঝোপের মধ্যে গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিতে হ'ল। দেখতে দেখতে ক্যালেমিয়োতে আমাদের একমাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন হুকুম এল আমাদের প্রকৃত রণাঙ্গনে লড়াই করতে যেতে হবে। মনটা তাজা হয়ে উঠল। বাঙালীর ছেলে ছেড়ে এসেছি আমার দেশ, নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি। আমার জন্মভূমিকে স্বাধীন করতে আজ আমার ডাক এসেছে। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। মরতে একদিন হবেই। আমাদের কাছে এখন "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"। যদি আমার একফোঁটা রক্তও দেশ স্বাধীনকরার জন্য কাজে লাগে, আমি মনে করবো জীবন আমার ধন্য। মহাপ্রেরণা আমাদের মনে আছে। হুকুম পেয়েই আমরা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া সব কিছু আমরা ফেলে দিলাম। আমাদের ওপর অর্ডার হল—এগিয়ে চলবার। আমাদের এগুতে হবে। পাহাড়, নদী, বন, জংগল তুচ্ছ করে শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে। গরিলা রণনীতিই আমাদের হবে একমাত্র অবলম্বন।

বুঝতে পারি—সামনে সীমাহীন বিপদ-সমুদ্র। যে পথ দিয়ে এগুতে হবে, তা শত্রু-সৈন্যরা অধিকার ক'রে রেখেছে। সে পথ পরিষ্কার করতে না পারলে আমাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগসূত্র থাকবে না। সরবরাহ. সৈন্যাগ্রগতি সবই তা'হলে বন্ধ হ'য়ে থাকবে।

...নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠলাম। তৈরী হ'লাম ভবিষ্যৎ দুর্গম যাত্রার পথিকরূপে। ভারী জিনিসপত্র যা ছিলো সব ফেলে দিলাম। সঙ্গে থাকলো পরণের একটিমাত্র প্যাণ্ট, গায়ে একটিমাত্র জামা, মাথায় টুপি, পায়ে বুট। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কারুর কাছে থাকলো পিস্তল, কারুর কাছে রাইফেল, কারুর কাছে বা টমিগান, আর ২৫টি থেকে ৫০টি পর্যন্ত গুলি। লোহার টুপী (Steel helmet) ও গ্যাস্ মাস্ক আমাদের দেওয়া হলো। কিন্তু নিতে পারলাম না। আমাদের পিঠে থাকলো একটা করে 'পিট্টু (Pack)। সেই পিট্টু'র মধ্যে থাকলো ৪ হাত লম্বা ২½ হাত চওড়া একটা কম্বল। তখন ভীষণ শীত, কম্বল না হলে উপায় ছিলো না। আর থাকলো নিজের নিজের রসদ, একটু ওষুধ, First aid দেওয়ার মতন কিছু ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি।

রসদ বলতে, পনেরো দিনের মত চাল, একটু নুন; আর পাঁচ দিনের মত শুষ্ক রসদ (Dry ration)—যেমন, ছোলাভাজা, বিস্কুট। মোটমাট ২০ দিনের রসদ থাকলো মজুদ প্রত্যেকের কাছে। হুকুম হলো দরকার হলে ঐ রসদে একমাস চালাতে হবে। এটুকুও জানিয়ে দেওয়া হল যে, কোন বিশেষ স্থান অধিকার করতে না পারলে আমাদের আবার নতুন করে রসদ পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

জল পরিষ্কার করবার জন্য আর উদরাময় থেকে বাঁচবার জন্য দেওয়া হলো কিছু ওষুধ। রাঁধবার ও খাবার জন্য থাকলো মেস্‌টিন।

জলের বোতলটা অবশ্য নিতে ভুললাম না। কারণ ওটাই যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

যাত্রা এবার স্বরু হবে। নেতাজী সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে যে বাণী দিয়েছেন তা স্মরণ করলাম:

'দূরে, বহুদূরে নদ নদী ছাড়াইয়া অরণ্য পর্বত ছাড়াইয়া ঐ আমাদের মাতৃভূমি। ঐ দেশে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। ঐ শোন ভারত আমাদের ডাকিতেছে। ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে। আটত্রিশ কোটি দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাকিতেছে।

'উঠ! নষ্ট করিবার মত সময় আর নাই। অস্ত্র হাতে নাও। দেখ, তোমার সম্মুখে স্বাধীনতার পথ রহিয়াছে। যে পথ আমাদের পূর্বগামীরা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রু-সেনার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি চাহেন আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিব। যে পথ দিয়া আমাদের সেনা বাহিনী দিল্লীতে পৌছিবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব।

'দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ—। চ'লো দিল্লী।'

(১৫)

দুর্গম পথে

শীতের রাত।

ঘন কুয়াসার সঙ্গে চাঁদের আলো জড়িয়ে এক অপরূপ রোমাঞ্চ-মাদকতার সৃষ্টি ক'রেছে। জঙ্গলের স্তব্ধতা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত ভয়াবহ!

সেই জমাট স্তব্ধতার মধ্যে খালি শব্দ হচ্ছে খস্ খস্ খস্…। অতি ধীর-মৃদু একটা থেমে থেমে শব্দ। দূর থেকে শুনলে মনে হবে, হয় বাতাসে জঙ্গলের পাতা কাঁপছে, নয় কোনো হিংস্র শ্বাপদ চলেছে শীকারের খোঁজে। হিংস্র শ্বাপদ!…

হ্যাঁ, ভাই, শ্বাপদই বটে!

জঙ্গলের সরু পথ দিয়ে আমরা চলেছি। পথের দু ধার দিয়ে—সার বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছি…পায়ের বুটে শব্দ উঠছে খস্ খস্ খস্…। একসঙ্গে চলি না—মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ি। শব্দটাকে যতোটা পারা যায় বন্ধ ক'রে তোলবার জন্যে।…চোখ আমাদের জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলে… পা ফেলি সাবধানে…হাতের বেয়নেট্ কঠিন ভাবে ধরা থাকে।

১লা মার্চ। আমাদের যাত্রা সুরু হ'লো অজ্ঞাত দুর্গম পথে। ক্যালেমিয়ো থেকে ১৮ মাইল দূরে ফোর্ট হোয়াইট্ জাপানীদের হাতে র'য়েছে এখনো। সেখান থেকে ১২ মাইল দূরে 'টিডিমে' হচ্ছে ইংরেজ সৈন্যের ডিফেন্স্।

এই দুই বিপক্ষ দলের মধ্যে সারাক্ষণ কামান দাগা চলছে। সেই শব্দ পাহাড়-পর্বত ও উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। যতোক্ষণ এই কামান দাগার শব্দ হয়—আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। কেননা সে সময় পায়ের শব্দটা চাপা পড়ে থাকে। এতোদিন যখন পথ হেঁটেছি—তখন কথা বলা নিষিদ্ধ ছিলো না কেননা—শত্রুপক্ষ ছিলো দূরে—ভয়েরও তাই কোন কারণ ঘটেনি। এখন আর সে উপায় নেই। কামানের শব্দ যতক্ষণ প্রতিধ্বনিত হয় ততক্ষণই যা হয় ফিস্ফাস্ ক'রে দু একটা প্রয়োজনীয় কথা বলে নিই, নয়তো বোবার মতন পথ হাঁটি। মনের মধ্যে গুমরে ওঠে :—

"দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

...এমনি ক'রে এগিয়ে এলাম ২।৪ মাইল।

হঠাৎ দেখি একটু দূরে আগুন জ্বলছে। বুঝতে পারলুম টাইম-বোমা পুঁতে রেখেছিলো শত্রুপক্ষ আগে থেকে। গতির পথে এমনি করেই বাধা সৃষ্টি করা যুদ্ধরীতি। আগুন দেখে আমরা একটু চিন্তান্বিত হ'য়ে উঠলাম। রাস্তার দু'দিকেই আগুন জ্বলছে। অথচ ওই একটি মাত্র পথ—আর সেই পথ দিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—। জানি ওই আগুনের আশে পাশে হয়তো সারা পথটাই শত্রুপক্ষ টাইম্-বোমা দিয়ে ছেয়ে রেখেছে। কঠিনতম বিপদ।

সাবধান! সাবধানে এগিয়ে চলো— কম্যাণ্ডার হুকুম দিলেন। বুঝি বা এক পলকের জন্যে মনে হলো—সামনে নিশ্চিত মৃত্যু। পরক্ষণেই সারা শরীর এক অব্যক্ত উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো! 'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো' সমস্ত দেহের মধ্যে অনুরণিত হয়ে উঠলো নেতাজীর বাণী—'ভগবান যদি চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিব। শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব।'

এগিয়ে চললাম। একজন—একজন করে। যাতে টাইম্ বম্ব্ ফাট্‌লে অনেকের একসংগে প্রাণহানি না হয়।

আগুনের পথটুকু দৌড়ে পার হ'তে লাগলাম।

....জনা দশেক এমনি ক'রে পেরিয়েছে। এবার আমার পালা। সতর্ক চোখে একবার আগুনের দিকে তাকিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড় দিলাম। আমি আগুনের পারে পৌঁছেচি—আর একজন আসছে—এমন সময় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ফেটে উঠলো একটা

বোমা। সংগে সংগে আমরা মাটিতে শুয়ে পড়লাম। সেটা শেষ হ'তে না হ'তে আর একটা। এমনি করে চারটে বোমা ফাটার পর —এলো বিরাম। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। বারুদের গন্ধ, ধোঁয়া আর আগুনে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিলো। আবার দৌড়ুতে সুরু করলাম। পেছোনে রয়েছে অন্যান্য সংগীরা। কেউ যদি ইতিমধ্যে বোমার আঘাতে জখম হয়ে গিয়ে থাকে জানি না। জানবার সময়ও নেই।

এমনি ভাবে প্রায় আধ মাইল দৌড়ে এসে আমরা দৌড়ানো বন্ধ করে—জোরে হাঁটতে লাগলাম।

প্রায় ছ' সাত ফার্লং পথ অতিক্রম করবার পর আমরা দাঁড়ালাম। কম্যাণ্ডার সকলকে একত্র ক'রে দেখে নিতে লাগলেন—সকলে ঠিক আছি কি না! সৌভাগ্যের বিষয় আমরা সকলেই ঠিক ছিলাম। কোন 'ক্যাজুয়ালটি' হয় নি। এমন কি—যে সৈনিকটি ছুটে আসবার পথে বোমা ফেটেছিলো সেও বেঁচে গেছে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

এতোটা এসেও দাঁড়ালে চলবে না। আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে। যেখানে অন্ততঃ শতকরা চল্লিশ ভাগও নিজেদের নিরাপদ বলে ভাবতে পারি। অতএব এগিয়ে চললাম।

মাইল দুয়েক এগিয়ে এসে আমরা দাঁড়ালাম। কিছুটা নিরাপদ বলে মনে হ'লো নিজেদের। বিশ্রাম নিতে লাগলাম।

১০।১৫ মিনিট করে বিশ্রাম নি, আবার পথ চলি।

ছ' সাত মাইল এগিয়ে এসে—আবার টাইম্ বোমা ছড়ানো এক এলাকায় এসে হাজির হ'লাম! ঐ এলাকায় টাইম্ বোমা ফেলবার বিশেষ কারণ ছিলো—। 'ফোর্ট হোয়াইটে' যাবার ওই

একমাত্র পথ। তাই শত্রুপক্ষ 'রোড ব্লক্' করবার জন্যে এমন আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছে। মনে মনে আমরা শত্রুপক্ষের এ প্রচেষ্টায় হাসলাম!

আমরা তো মৃত্যু-পণ করে স্বাধীনতার মূল্য দিতে এগিয়ে চলেছি! আমাদের কাছে এ বাধার অর্থ কি? ভালো করেই তো জানি অকল্পনীয় অনেক বাধার সম্মুখীন আমাদের হতে হবেই। তা বলে কি আমরা ভয় পাবো—না থেমে যাবো! অসম্ভব—মরি আর বাঁচি—আমরা এগিয়ে যাবো যতোদিন না—ভারতের বুকে আমাদের স্বাধীন পতাকা স্থাপন করতে পারি।

'টাইম-বোমা' ছড়ানো এলাকাটি অনেকক্ষণ পেরিয়ে এসেছি। এখন যে পথ দিয়ে হাঁটছি, সে পথ ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। বুঝতে পারলুম পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি।

রাত গভীর হয়ে এলো। লতাগুল্ম-সংকীর্ণ পথ দিয়ে পাহাড়ি পথ অতিক্রম করছি। অনভ্যস্ত পা—আর এগুতে চায় না। অত্যধিক পরিশ্রান্ত বোধ করছি নিজেদের। তার সংগে খিদে পেয়েছে প্রচুর। কিন্তু কি করবো একটা বিস্কুটও মুখে দেবার উপায় নেই। কুড়ি দিনের রসদ আছে সে রসদে চালাতে হবে তিরিশ দিন। শুধু তিরিশ কেনো—যতোদিন কোনো একটা বিশেষ জায়গা অধিকার করতে না পারি। জল তেষ্টা পেয়েছে—তবু এক ফোঁটা জল খাবার উপায় নেই। যদি ফুরিয়ে যায়—কেউ আর এক ফোঁটা জল দেবে না। অজানা পথ দিয়ে চ'লেছি; যেমন ক'রে হোক রাত-টুকু এই জলে কাটাতে হবেই। মনে মনে ভাবছি—কোনো রকমে রাতটা কাটলে হয়—ভোর হলেই মার্চ খতম ক'রে কাছাকাছি কোনো পুকুর, ঝরণা যেখান থেকে হোক—পেট ভরে জল খেয়ে শুয়ে প'ড়বো।

…এই রকম যখন অবস্থা, তখন আমার সাথী বন্ধুতুল্য এক

বিহারী অফিসার বললেন—"ভাই বোস্, ভীষণ জল তেষ্টা আর খিদে পেয়েছে....আমার আর চলবার সামর্থ্য নেই !"

'কিছু খেয়ে নিন—!'—আমি বললুম।

'কি করে খাবো? আমার জিনিস খোলা যাচ্ছে না। তোমার পকেট থেকে বের করো।'

মুহূর্তের জন্যে আমার মনে ভয়, ভাবনা হাজির হ'লো। যদি কমাণ্ডার তল্লাসি করেন (কারণ তাঁর তল্লাসি করবার কথা) তা হলেই তো সমূহ বিপদ। কিন্তু 'না' ব'লতে পারলাম না। হাজার হোক্—আমি বাঙালী। বাঙালী জাত অন্তরে সত্যিকারের বৈষ্ণব ...তার মনের গড়ন ঠিক স্বার্থপরের মতন নয়। পকেট থেকে কিছু বিস্কুট আর জল দিলাম তাঁকে।...

২রা মার্চ ভোরে আমরা 'ফোর্ট হোয়াইটের' কাছাকাছি এসে হাজির হ'লাম। সমস্ত রাত চ'লে—মাত্র ১৮ মাইল রাস্তা অতিক্রম করেছি।...

....সকালে আহারাদি করে একটু সেই পাহাড়ী জংগলে ঘুমানো গেলো। শুনতে পাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে 'ফোর্ট হোয়াইট' থেকে গর্জে উঠছে জাপানীদের দূর পাল্লার কামান। আর টিডিম থেকে শত্রুপক্ষ দিচ্ছে তার জবাব।

....মাঝে মাঝে তোপের গোলা এসে পড়তে লাগলো আমাদের আশে পাশে। ভূমিকম্পে যেমন করে চিড় খেয়ে যায় জমি, ছিটকে ওঠে মাটি তেমনি করে আশে পাশের জমি গুলো তছ্‌নছ্ হ'তে লাগলো। জংগলের গাছপালা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠলো।

...অবশ্য আমরা এতে ভয় পেলাম না। ভয় পাবার কি বা আছে? মালয়ের যুদ্ধ দেখে এ সবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম: তাই এ দুর্যোগ আর তেমন বিচলিত করতে পারলে না।

…সারাদিন কাটলো বনের ভেতর। সন্ধ্যের আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তৈরী হ'লাম। আবার পাহাড়াভিযানে বেরুতে হ'বে। সেই বিপদসঙ্কুল রাত্রি-অভিযান। সে স্বাদ কি আজ ভুলতে পারি!

…রাত্রি ‥

….সুরু হ'লো দুর্গম পথে যাত্রা। গত রাতে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম আজ আর সে রাস্তা নয়। কালকে যে রাস্তা দিয়ে এগিয়েছিলাম—সেই রাস্তা ছিলো বেশ খানিকটা চওড়া। সব রকম যান বাহন চলাচল করতে পারতো সেই পথ দিয়ে। কিন্তু আজ সে রাস্তা ছেড়ে দিতে হ'লো। কারণ 'ফোর্ট হোয়াইট্' ও টিডিমের মধ্যবর্তী এলাকা আমাদের শত্রুপক্ষের অধিকৃত।…

…পাহাড়ী পায়ে হাঁটা সরুপথে এবার সুরু হ'লো পথ চলা। পাথরের নুড়ীতে রাস্তা ভরা। তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না। পদস্খলন হবার ভীষণ ভয়। শব্দও হয় রীতিমত তার ওপর আবার হঠাৎ শত্রু আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা।

পাহাড়ের চড়াই ও উৎরাই—

যখন চড়াইয়ে উঠি ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পনে। নীচে নামবার সময় তাল রাখতে পারি না সব সময়। ঢালুর পথ—, নেমেছি তো নেমেই চলেছি।

অত্যধিক পরিশ্রম হতে লাগলো এই ওঠা নামার দরুণ। পাহাড়ী অঞ্চলের শীতও কোথায় পালিয়ে গেলো—তার পরিবর্তে ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠলাম। মাথার চুল থেকে বুটের ভেতর পা পর্যন্ত ভিজে জল হয়ে গেলো।

'কি রকম ঘামছি দেখেছ?' একজন বললো।

'ঠিক যেনো বৃষ্টিতে ভিজেছি বলে মনে হচ্ছে'—একজন উত্তর দিলো।

একটু চুপচাপ...সামনে এলো আবার একটা চড়াই।

বাঁচি মরি ক'রে আবার উঠতে লাগলাম। খানিকটা উঠে সারা পা কাঁপতে লাগলো...আর মনে হলো যেনো রক্ত জমে গেছে। পা আর চ'লে না, পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে...সমস্ত পেটের নাড়ী গুলো পাক দিতে সুরু ক'রেছে। যদি কম্যাণ্ডার ব'লে কোনো জিনিস না থাকতো— আমরা বোধ হয় খানিকটা ব'সে বিশ্রাম করে নিতাম।

'বোস্, তুমি যে দেখছি পাল্লা দিয়ে চ'লেছো!' খাজান সিং বললো।

খাজান সিং পাঞ্জাবী সৈনিক। তাহার লম্বা চওড়া স্বাস্থ্য।

'হ্যাঁ তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার এই তো একমাত্র জায়গা।' আমি বোললাম।

কথাটা খাঁটি সত্যি! আমার জিদই ছিলো তাই। বাঙালী ব'লে অনেক সময়ে এরা ঠাট্টা ক'রতো। আজ অবস্থা গতিকে আমার দলে আমি একমাত্র বাঙালী, এবং এই সব পাঞ্জাবী বীরদের সাথী। নিজেকে ওদের সমকক্ষ প্রমাণ করবার একমাত্র অবসর।

রুখ্ জা (Halt): হঠাৎ কম্যাণ্ডারের আদেশ হ'লো। থমকে দাঁড়ালুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের বিশ্রাম করবার অনুমতি দেওয়া হ'লো।

বোধ হয় মিনিট দশেক হ'বে—ব'সে গলাটা একটু ভিজিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছি এমন সময় আর একজন পাঞ্জাবী অফিসার আমাকে বললেন:

'ভাই বোস, আপ ক্যায়সে চলতে হো? কেয়া আপ্‌কা পাহাড়মে চড়নেকা আদাত হ্যায় ?'

'আপকো ক্যায়সা মালুম হোতা হ্যায় ?' আমি বললুম।

'ম্যায়তো শোঁচ রহাহুঁ ইয়ে আপকো বহুতি আদাত হ্যায় !'

'থোড়া বহুত—!' ব'লে হাসলাম।

পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হ'লো। নিজের প্রশংসা বিশেষ ক'রে এ ক্ষেত্রে কার না ভালো লাগে।

··একটা মজার কথা এই যে, বিশেষ পরিশ্রমের পর বিশ্রাম জিনিসটা বড়ই আরামপ্রদ। বিশ্রামের পূর্ণ আনন্দ তা না হ'লে বোঝা যায় না।···এতো পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম পেয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করছিলাম।....বেশ বাতাস দিচ্ছে, পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ ক'রে এলিয়ে বসে আছি···লোভ জাগে 'আঃ. যদি এমনি ক'রে সারাটা জীবন বসে কাটিয়ে দেওয়া যেতো !'

···মিনিট কুড়িও বোধ হয় হয়নি। কম্যাণ্ডারের আবার হুকুম হ'লো—তৈয়ার হো (Be ready).

...ধড়মড় ক'রে সব উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের বুটটা বার কয়েক জোরে জোরে ঠুকে নিলাম।

···চলরে ন'জোয়ান্‌...।' আবার সুরু হ'লো চলা।...

....খানিকটা বেশ হাঁটা গেলো। রাস্তা ভালো। তার ওপর বিশ্রাম নিয়েছি খানিকক্ষণ অতএব জোর এবং স্ফূর্তি দুই-ই সঞ্চয় ছিলো।

হায় কপাল! বেশি দূর কি তেমন অক্লেশে যাওয়া গেলো? যা কল্পনা করি নি তাই ঘটলো। সামনে সাপের ফণা দেখার মতন

চমকে উঠলাম। সামনে অপেক্ষা করছে বিপদ সংকুল গর্ত (Ditch) ভর্তি একফালি পথ। দেখলে সমস্ত বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়।.. সরু পথের গা গড়িয়ে গর্ত, এক-একটা তিনশো চারশো ফুট তো হ'বেই। একজনের বেশি দুজনে এগুবার উপায় নেই।...

...উপায় কি, এগুতেই হবে। সব ভয় ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পা বাড়ালাম।· খুব সংযত পদক্ষেপে, পা টিপে টিপে এগুতে লাগলাম। একটু গোলমাল হয়েছে কি একেবারে চির-নিদ্রার কোলে।

...কতক্ষণ সময় কেটে গেলো কে জানে? কোন হুঁস নেই মন্ত্রমুগ্ধের মতন চ'লেছি তো চ'লেইছি।

...কখন ভোর হ'য়ে এলো কে জানে! হঠাৎ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'লো 'ব্যাম্বু' ক্যাম্প। 'ব্যাম্বু' হচ্ছে অস্থায়ী ক্যাম্প। সে যাই হোক্,—'ব্যাম্বু' ক্যাম্প দেখে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'ব্যাম্বু' ক্যাম্পে হাজির হ'য়েই জানলাম যে সূর্য ওঠবার আগেই আমাদের রান্না-বান্না শেষ ক'রে ফেলতে হ'বে! কুচ্ পরোয়া নেই খাওয়া আগে। বেরিয়ে পড়লাম জল আনতে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে হাজির হ'লাম ক্ষীণ এক ঝরণার কাছে। পাহাড়ের গা বেয়ে জল পড়ছে....শীর্ণ-ক্ষীণ জলধারা। দেখলে হাসি পায়। এই কি ঝরণা নাকি? কিন্তু জল নেওয়া নিয়ে হ'লো বিপদ। অবশেষে একটা খেজুর গাছে লাগাবার নলির মত একটা নলি লাগিয়ে তার সাহায্যে জল নিতে হ'লো।

··কোনো রকমে চাল ফুটিয়ে পেটের জ্বালা নিবৃত্তি করলাম।...

···তারপর দীর্ঘ দিন। ব্যাম্বু ক্যাম্পেই বিশ্রাম নিয়ে ঘুমিয়ে বিকেল পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যা হ'তেই বেরিয়ে পড়া গেলো।

মাইলখানেক পথ অতিক্রম করার পর আমাদের সঙ্গে সাহায্যকারী কিছু জাপানী সৈন্য যোগ দিলো।...

···আজ আর যা তা ভাবে চলছি না। আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেসিনগান্, ৩ ইঞ্চি ৪ ইঞ্চি মোরটার, কিছু গোলাগুলি। কতকগুলো ঘোড়া আর খচ্চর মিলে এই সব অস্ত্র শস্ত্র বয়ে নিয়ে চলেছে।

এবারে যে রাস্তা দিয়ে চলেছি তা একরকম ভালোই। ছ সাত ফুট চওড়া রাস্তা। দূরে দূরে জংগলের আভাষ···রাত্রে তা কালো চাদরের মত বিছানো র'য়েছে।···

এমনি ভাবে চলে রাত কেটে গেলো। যেখানে ভোরে পৌছোবার কথা ছিলো সেখানে পৌছোতে পারলাম না। ভোরে হাজির হলাম একটি পাহাড়ী নদীর কাছে। বেলা হলে শত্রু বিমানের উৎপাত বাড়বে। যাত্রা পথে সৃষ্টি হবে বাধার। খুব ভালো করেই জানি শত্রুপক্ষ এখানে ওত পেতে বসে আছে। দিনের বেলায় এগুলেই তাদের চোখে পড়বার আশংকা খুব বেশী। তাই না এগুনোই সাব্যস্ত হলো।

সেই পাহাড়ী নদীর ধারে ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে চরাতে ছেড়ে দিলাম।

·· তারপর সুরু হলো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। সেই নৈমিত্তিক খাদ্য। কোনো রকমে দুটি চাল সেদ্ধ ক'রে নেওয়া।

খাওয়া দাওয়া সবেমাত্র শেষ করেছি এমন সময় আমাদের কম্যাণ্ডার ও জাপানী অফিসার কী যেন পরামর্শ করে হুকুম দিলেন তৈরী হয়ে নিতে। দিনের বেলায় এ পথে যাওয়ার হুকুম হবে আশা করি নি। কিন্তু আশা করা আর বাস্তবে ঘটা—যুদ্ধক্ষেত্রে এ দু'টো একেবারে বিভিন্ন ব্যাপার। বুঝলাম কোনো কিছু একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে। নয়তো এ আচমকা হুকুম হতো না। অর্ডার যখন সুরু হয়েছে তখন আর কথা নেই। তল্পি-তল্পা গুটিয়ে হাঁটা সুরু কোরলাম।

…বেশ যাচ্ছি।…আমাদের পায়ের বুটের শব্দ আর ঘোড়া ও খচ্চরদের খুরের শব্দ সেই নিস্তব্ধ পার্বত্য বনভূমিতে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। ক্ষীণ গানের মিড়ের মত সে শব্দ……।

গোঁ-গোঁ…দূর থেকে শব্দ এলো ভেসে। নিমিষে আমরা সচকিত হ'য়ে উঠলাম। আমাদের কম্যাণ্ডার চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে তাকালেন আকাশের দিকে।…

শব্দ ক্রমাগত কাছে আসতে লাগলো। নিঃসন্দেহে বুঝলাম এ হচ্ছে শত্রু বিমান! যাক্ তেমন কিছু ভয়ের কারণ নেই। কেননা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে আমরা চ'লেছি…শত্রু বিমান সহজে দেখতেও পাবে না আর ঘায়েল করতেও পারবে না।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হ'লো। শত্রুদল কোনো হদিস করতে না পেরে বার কয়েক গোঁ গোঁ ক'রে পাক মেরে আন্দাজে কতকগুলো বোমা ফেলে ফিরে গেলো। বুঝলাম ওরা এমনিই আসে আর বোমা ফেলে। এই রাস্তাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ…অথচো এমন অবস্থায় ঢাকা যে সোজাসুজি বিমান আক্রমণের উপায় নেই! শত্রুপক্ষ তাই মাঝে মাঝে উড়ে এসে গোটা কয়েক বোমা ফেলে জানিয়ে যায়—তারা নজর রাখছে পথের ওপর।…

রাস্তাটা প্রায় দেড় মাইল হ'বে। দেড় মাইল অতিক্রম করার পর আমাদের গন্তব্য স্থানে এসে হাজির হলাম।

জায়গাটি বেশ। পাহাড়ের পাদদেশে বিচ্ছিন্ন বনভূমিতে ঢাকা। ছুটি পাহাড়ী নদী এসে মিশেছে। আয়নার মতন ঝক্‌মক্ করছে জল। যেমন পরিষ্কার তেমনি ঠাণ্ডা।...

এ ক'দিন মার্চ করার পর অমন জায়গা পেয়ে মনটা আনন্দে ভ'রে উঠলো।

...ক'দিন স্নান করা হয় নি। আরাম করে স্নান করতে গেলাম।

অর্ডার হলো—সে দিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ আমাদের মার্চ করতে হবে না।

...৫ই (মার্চ) আমাদের আবার মার্চ করবার কথা। কিন্তু তা হ'লো না। তার পরিবর্তে হুকুম হ'লো যে আমরা যেন ৪।৫ দিনের জন্য সর্বতোভাবে তৈরী হয়ে নি। খাবার দাবার যা করবার ..চার পাঁচদিনের মতন করে নি। কারণ এবার একেবারে শত্রু ব্যূহের মধ্যে ঢুকছি। সময় ও সুযোগ পাবো কি না তার কোনো স্থিরতা নেই।

দমে যাবার কোনো কারণ ছিলো না। চার পাঁচ দিনের মতন ভাত আর নুন যোগাড় করে নিলাম।

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম বেয়নেটের তীক্ষ্ণ খোঁচায় শত্রুর বুকের পাঁজর ছেঁদা ক'রে দিয়েছি। ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। আর সে রক্ত আমাদের শরীর দিয়েছে রাঙিয়ে।

৬ই মার্চ...।

...সন্ধ্যে হতেই যাত্রা হলো সুরু...। সতেজ দেহে হেঁটে চলেছি। প্রায় ছু'দিনের বিশ্রাম শরীরে এনে দিয়েছে বল।

··খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলুম এবার আর আগের মতন ছোটো খাটো পাহাড় নয়—বেশ উঁচু পাহাড়েই উঠতে হচ্ছে।··· রাস্তাও আগের মতন চওড়া ও পরিষ্কার নয়। এতো অপরিসর পথ যে তিনটে খচ্চর এগুতে গিয়ে গড়িয়ে পড়লো। যে জাপানী তিনটি ওদের চালাচ্ছিলো তারা সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গিয়ে মাল-পত্তর কুড়িয়ে আনলো। দুঃখের বিষয় এই যে, খচ্চর তিনটিকে আর উদ্ধার করতে পারলো না···

এরপর আরো সাবধানে পথ হাঁটতে লাগলাম।

···প্রায় শেষ রাতে যখন একটু বিশ্রাম করছি তখন দূর পাল্লার কামান গর্জে উঠলো।···সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। নিশানাটা দেখি আমাদের দিকেই।···মাটিতে শুয়ে কানে আঙ্গুল গুঁজে পড়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। মাথার ওপর দিয়েই মনে হলো যেন গোলা চলে গেলো।

···কামান গর্জন থামতে ঝুঁকে হেঁটে ক্রমশঃ বাঁ দিকে চলে গেলাম। কোনো রাস্তা নেই। না থাকুক··এমনি অন্ধের মতনই সামনে এগিয়ে যাবো। পরে এক সময় রাস্তার যোগ সূত্র খুঁজে নিলেই হবে।

৭ই মার্চ....!

সাতই মার্চ আমরা সমতলভূমি দিয়ে এগুতে লাগলাম। আমাদের পথে পাহাড় নেই, কিন্তু পাহাড়ে ঘেরা জায়গাটা। আমরা হাঁটছি নদীপথ ধরে।· নদীটা কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও বিস্তৃত। বার কুড়ি পাঁচিশ নানাভাবে ওই নদীটাকে আমরা অতিক্রম করলাম।··

তখন রাত্রি বারোটা একটা হবে। আমাদের দলটি ভাগ হয়ে গেছে। একদল রয়েছে খানিকটা এগিয়ে, আমরা মধ্যে, পেছোনে

রয়েছে আর একদল। আমাদের দলকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছি। একটা জায়গায় এসে দাঁড়াতে হলো। সেই নদীটি আবার পেরুতে হবে। অবশ্য নদী বলতে প্রায় হাত পঁচিশেক চওড়া আর হাত দেড়েক গভীর হবে। নীচে পাথর।....আমি প্রথম পাথরটায় একটা পা দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটায় পা দেবার জন্যে যেমন আর একটা পা তুলেছি···অমনি স্লিপ্ করে একেবারে 'পপাত'। বুক পর্যন্ত জলে ভিজে গেলো। যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন থলিতে রাখা আমার তিন চারদিনের ভাত জলে ভিজে কাদা হয়ে গেছে। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেলো। সংগীরা তো হেসেই অস্থির। কী অবস্থা! একটি মাত্র প্যান্ট আর সার্ট পরণে·· তাও গেলো জলে ভিজে; তাও আবার শীতকাল।...ঠাণ্ডায় শরীর জমে যেতে লাগলো, তার সঙ্গে আবার ভাবনা হলো ভাতের।···শত্রুর ব্যূহের মধ্যে ঢুকেছি। খাবার পাবার আশা নেই। এদিকে যা ভাত ছিলো তা তো জলে ভিজে গেছে। হয় তো পচে যাবে। যদি যায়, তখন—তখন কি হবে? কি খাবো? সুতরাং এক কণা ভাত ফেলবারও উপায় নেই!

···পরের দিন সূর্য উঠতেই ভাতগুলো রোদে শুখোতে দিলাম।

এমনি ক'রেই দিনের পর দিন আমরা চলেছি। পার্বত্য উপত্যকা, নদী, বন, সমতল ভূমি···যখন সামনে যা পড়েছে...পদদলিত ক'রে এগিয়ে চলেছি। দিন নেই, রাত্রি নেই। খাওয়া, ঘুম, স্নান... কখনো হয়, কখনো হয় না। মাঝে সমস্ত শরীর বিদ্রোহ ক'রে বসে ···একপাও আর এগুতে চায় না···সারা দেহ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠতে থাকে....তবু আমরা থামি না। এ যেন সেই—

'তবু বেয়ে তরী হ'তে হ'বে পার
সময় যে নেই শুধাবার…'

যেতে হবে এটুকু শুধু জানি। সে যাত্রার শেষ কোথায়… কবে থামবো জানি না। মন যখন অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে ওঠে, এক-মনে নেতাজীকে স্মরণ করি। নেতাজীর দেবানুপম তেজোগম্ভীর মূর্তি চোখের ওপর ভেসে ওঠে। কানের কাছে বাজে তার সেই তূর্যনিনাদ—

'ক্ষুধায় দিতে পারবো না খাবার—রোগে দিতে পারবো না ওষুধ—দিতে পারবো না পোষাক—তবু যে যাবে মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে, সে এসো…'

….মুহূর্তে মন ভরে ওঠে নতুন সাহসে। মনে পড়ে নেতাজীর কাছে শপথ…। দৃঢ় কণ্ঠে বলি—'নেতাজী, আমি মরবো—তবু আমি ফিরবো না। আমি যাবো। জয় আমার মাতৃভূমির… জয় হিন্দ……"

…এইভাবে চলতে চলতে ১০ই মার্চ আমরা এক পাহাড়ী বস্তিতে এলাম। পাহাড়ের রুদ্র গম্ভীর সৌন্দর্য মনকে কেমন যেন উদাস করে দিলো—কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেলাম আমাদের কর্মপদ্ধতি, ভুলে গেলাম আমাদের সামনের আদর্শ—ভুলে গেলাম নেতাজীর বাণী। আমাদের যুদ্ধ-ক্লান্ত মন মুক্ত নীল আকাশ আর খদিরাভ পাহাড়ের রহস্যে অভিভূত হয়ে পড়লো। মাঝে মাঝে ক্ষীণাঙ্গী ঝর্ণা চোখে পড়তে লাগলো। পাহাড়ের বুক চিরে সাপের মত এঁকে বেঁকে কল কল শব্দে বয়ে গেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক জাতের অজস্র গাছ দেখলাম। খুব লম্বা লম্বা আর মাথার ওপর মুরগীর ঝুঁটির মত পাতা। অনেকটা আমাদের দেশের ঝাউ গাছের মত।

মাঝে মাঝে জন বিরল পথ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে লোকচলাচলে সৃষ্টি হয়েছে। সহরের সে কোলাহল নেই, জীবনের সে উদ্দাম গতি নেই, বিশ্ব জুড়ে যে বিরাট যুদ্ধ চলছে তা এখানে বোঝবার উপায় নেই। চারিদিকে প্রশান্তি বিরাজ করছে। বর্ত্তমান সভ্যতার আওতা থেকে এই পাহাড়ী বস্তী যেন বহু দূরে। নির্জন পথ লোকজনের ভীড় নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করলাম—

"উড়াব উর্দ্ধে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে
দুর্গম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চা'ব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি ছিন্ন পালের কাছি'
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।"

প্রকৃতি এই পাহাড়ী বস্তীকে সাজাতে কোন দিক থেকেই কার্পণ্য করে নি। সুস্থ সবল পাহাড়ী ছেলেরা আর স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা গ্রামখানিকে মুখর করে রেখেছে। এদের জীবনধারা বেশ—সভ্যতা ও শিক্ষার গর্ব এরা করে না—কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতা—দুর্ভিক্ষে দারিদ্র্যে এরা সভ্য পৃথিবীর অধিবাসীদের মতন ক্ষীণ হীন এবং মুমূর্ষ-প্রাণ নয়। মেয়ে পুরুষে পরিশ্রম করে এবং সেই অর্থে এদের দিন বেশ কেটে যায়।

...একটি বড় উঁচু পাহাড়ের ওপর এই গ্রামখানি। আমাদের দেখে এই গ্রামের লোকেরা উৎসুক হয়ে দেখতে এল। এরা বড়ই গরীব, কারুর গায়ে ভাল আস্ত একখানা কাপড় পর্যন্ত নেই। ছেঁড়া কাপড় বা নেংটি পরে থাকে। এরা গরীব হলেও এদের নিটোল স্বাস্থ্য আমাদের তাক লাগিয়ে দিল। উন্মুক্ত পাহাড়ে এই দেশবাসীরা

বাস করে—প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকে, রোগ দুঃখ শোক বলে কোন জিনিস জানে না। নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্তদিন পরিশ্রম ক'রে নিজেদের সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। অধিকাংশই এরা ছাগ, মুরগী, মেষ পালন করে। এদের প্রাণখোলা হাসি আর সরলতা আমাদের মুগ্ধ করল। আমরা দোভাষীর সাহায্যে কিছু খাবার চাইতেই আমাদের খুব যত্ন করে তরকারী, মুরগী, ডিম প্রভৃতি দিলো। নোট দিতে গেলে এরা নিল না। কাগজ মনে করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ফিরিয়ে দিলে। দোভাষীর সাহায্যে আমরা বুঝে নিলাম। তারপর যখন টাকা ও রেজগী দেওয়া হ'ল তখন তাদের মুখে সরল পার্বত্য হাসি দেখা দিল। শিশুর মতন সরল ভাবে টাকাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

টাকা পেয়ে তারা হ'ল বেজায় খুসী। আশ্চর্য্য! দুনিয়ার খবর কিছু জানে না।

দিনে বিশ্রাম, আর রাত্রে এগিয়ে চলি। চলেছি তো চলেছি। শেষ কোথায় কে জানে? হঠাৎ হুকুম হ'ল আমাদের ছয় জনকে দুদিনের পথ একদিনে যেতে হবে এবং শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে নাম দিলাম। সমস্ত জিনিস পত্র রেখে খালি যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে আর এক বোতল জল আর কিছু বিস্কুট নিয়ে শত্রু আক্রমণের উদ্দেশ্যে চল্লাম। মন বেশ তাজা, শরীরে প্রচুর উৎসাহ। আমরাই প্রথম শত্রুকে আক্রমণ করতে চলেছি! অপর দিক দিয়ে অন্য দল আসছে তাদের সঙ্গে মিলতে হবে। এগিয়ে চলেছি কত নদ, নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত অতিক্রম করলাম সে দিকে খেয়াল নেই। কারণ যে করে হো'ক আমাদের পৌছতেই হবে, তা না হলে এত বড় আয়োজন সব পণ্ড

হবে। কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস রেখে এবং নিজের ওপর আস্থা রেখে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে হুকুমের অপেক্ষায় রইলাম।•

(১৬)

১৪ই মার্চ, ১৯৪৪ ..

স্মরণীয় দিন। আমরা সন্ধ্যায় আদেশ পেলাম যে, বাহাদুর-দলের কর্মপদ্ধতি নিয়ে শেষরাত্রে আমাদের শত্রুদের আক্রমণ ক'রতে হবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে ম্যাপ দেখে সমস্ত বিষয় বুঝে নিয়ে আহারাদি শেষ ক'রে একটু বিশ্রাম নিলাম।

গভীর বন, ঘন অন্ধকার ; চারিদিক নিস্তব্ধ। উঁচু নীচু রাস্তা, পাহাড়ী জঙ্গল--তার ওপর আরম্ভ হ'ল প্রচণ্ড বর্ষা। অথচ আমাদের প্রায় পাঁচ মাইল এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। আমরা দিশে-হারা হয়ে পড়েছিলাম. কিন্তু যেই মনে জাগলো—সামনে মহৎ আদর্শ, আমি বাঙালী—যুদ্ধ করতে করতে মরব তবু পিছু হটব না--নেতাজীর আদর্শে বাঙালীর ভীরুতা ঘুচাব আমি—অমনি যেন কর্তব্যের আলো পড়লো চোখের সামনে—সবার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে পরিচালনার ভার নিতে এগিয়ে গেলাম তখনি। গ্রাম থেকে বের হ'য়ে সামনে পাহাড় থেকে নামা আরম্ভ হ'ল। খুব সন্তর্পণে নেমে চলেছি। বৃষ্টি টিপ্ টিপ্ করে পড়ছে—চারিদিক গাছ পাতা সব ভিজে—পা ফস্কালেই একেবারে শরীরের চিহ্ন থাকবে না। শত্রুর অধিকৃত এলাকা, যে কোন মুহূর্তে শত্রু বন্দুক, বেয়নেট প্রভৃতি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—জীবন-মরণ-সমস্যা! সজাগ্ হয়ে খুব সাবধানে আমরা চলেছি। পাছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এই জন্য আমরা বেয়নেট ধরে চলেছি। জীবন-মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা…।

হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে পাশের জঙ্গল নড়ে উঠল। আমরা অমনি সঙ্গে সঙ্গে position নিয়ে শুয়ে পড়লাম। বন্দুক হাতে তৈরী, কিন্তু ছুঁড়লে শত্রুপক্ষ সাবধান হয়ে যাবে তাই হাতে নিয়ে সবাই প্রস্তুত, ধরে রইলাম। চেয়ে চেয়ে অনেক সন্ধান করলাম আশে পাশে, কিছুই হদিস্ মিললো না। হয়তো বা কোন জন্তুও হতে পারে। এ অবস্থায় আমরা প্রকৃত পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে এগোতে লাগলাম। এবার আবার পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। দেখতে দেখতে রাতও শেষ হয়ে এল। মেঘ ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছে—ভাঙ্গা ফাটা মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না উঁকি মারছে। কিন্তু জ্যোৎস্নাকে আমরা আজ অভিনন্দন জানাতে পারছি না। সে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছে।

আমরা এগিয়ে চলেছি বাকি সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে। শত্রুর ব্যূহ্ (Enemy line) আর বেশি দূরে নয়। ৩।৪ মাইল আমরা প্রায় তিন ঘণ্টায় এলাম। সমস্ত সৈন্য শত্রুব্যূহের দিকে চলেছে। ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যের ভিতর প্রভাব বিস্তারের জন্য আমরা রইলাম পুরোভাগে। হঠাৎ এক ঝাঁক মেসিন গানের গুলি আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। আমরা সাবধান হয়ে Position নিলাম। আমাদের বিষয় কিছুতেই শত্রুপক্ষকে জানতে দে'ব না। আবার টা টা শব্দ করে এক ঝাঁক গুলি এল। এ কি! শত্রু মাত্র ২০০।২৫০ গজ দূরে পাহাড়ের ওপর, আর আমরা নীচে!

আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে আমরা পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করছি। কিন্তু শত্রুর চোখে ধূলো দেওয়া আর সম্ভব হোল না—তারা আমাদের গতিবিধি বুঝতে পেরেছে...অমনি আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ। এক সঙ্গে উভয় পক্ষের বন্দুক, মেশিন গান, ব্রেন গান, মোর্টার সব রকমারি শব্দ করে গর্জে উঠল। দেখতে দেখতে অন্ধকার জঙ্গল মুখরিত হয়ে উঠল।

শত্রুপক্ষের তুলনায় আমাদের সরঞ্জাম অত্যন্ত অল্প। কিন্তু আমরা হলাম বাহাদুর দলের। আমরা জীবন বিপন্ন করে লড়ে চলেছি মহৎ আদর্শকে লক্ষ্য করে। আমরা ভীষণ ভাবে গরিলা যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করে শত্রুদের ঘিরে ফেল্লাম। ১০০ গজ দূরে আমাদের শত্রু। হঠাৎ হুকুম হ'ল 'বেয়নেট চার্জ কর'। সঙ্গে সঙ্গে বেয়নেট তুলে নিয়ে আমরা প্রস্তুত হলাম। ভোর হয়ে আসছে—ক্ষীণ জ্যোৎস্না-আলোকে আমাদের শত শত বেয়নেট ঝলসে উঠল। আমরা ভীষণ বেগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ খুব সজোরে চল্ল সঙ্গীনের যুদ্ধ। তারপর আরম্ভ হ'ল শুধু আর্তনাদ! উঃ—আঃ আর পারি না, গেলাম, বাঁচাও…। উভয় পক্ষেই সৈন্য মারা গেল অনেক, অনেক হ'ল জখম। আমরাই জিতলাম অবশেষে!

১৫ই মার্চ, ১৯৪৪…

সকাল হ'ল। সমস্ত শরীর অবসাদগ্রস্ত। অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে জীবনকে মুঠোয় ধরে আমরা হয়েছি রণে জয়ী। সারা অঙ্গে ব্যথা, শরীর ক্ষত বিক্ষত।

দিনের আলোকে একবার রাত্রির যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত স্থান দেখবার ইচ্ছা হ'ল। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। চারিদিকে মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে—কত বিভিন্ন রকমের আঘাত পেয়ে। কারুর শুধু ধড়টাই পড়ে রয়েছে, কারুর চোখ দুটো গলে গেছে, কারুর হাত নেই, পা নেই, পেট চিরে নাড়ী ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে! আবার ২।৪ জন তখনও আহত অবস্থায় ক্ষীণকণ্ঠে কাতরাচ্ছে। কি ভয়াবহ দৃশ্য! এতদিন কেবল কল্পনাই করে এসেছি, কিন্তু চোখের সামনে যে এমন দেখতে হবে কখনও তা ভাবি নি। চিত্ত দুর্বল হয়ে এ'ল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। দেখলাম পৃথিবীতে শান্তি বলে কিছুই নেই।

"Heaps of Emotion Swept over me"—মৃতদেহ দেখে অনেক কথা মনের মধ্যে ভীড় করে এল। না জানি, আজ কত পিতা মাতা সন্তান হারালো, কত স্ত্রী স্বামী হারালো। এদের জন্য হয়তো কোন কোন সংসার একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। অমনি প্রশ্ন উঠল?—যুদ্ধ হয় কেন? মানুষ মানুষের ওপর কেন এরকম বর্বরের মতন হিংস্র আচরণ করে? উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে এল—। সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিকদের অত্যাচার আজ চরমে উঠেছে। মানুষের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে তারা বুকের রক্ত শুষে নিতে চায়। স্বার্থে স্বার্থে লাগে সংঘাত। তারই ফলে আসে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের ইন্ধন যোগায় নির্যাতিত নিরন্ন দুস্থ সন্তানেরা—যারা পেটের জ্বালায় পরাধীনতার চাপে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় পতঙ্গের মতন। বিশেষ করে আমরা ভারতবাসীরা। প্রাণ যদি যায় যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু দাম ধরে দেওয়া হয়। এইতো জীবনের মূল্য! এইতো ভারতবাসীর প্রাণের দাম! ভাবতে ভাবতে নেতাজীর বাণী চোখের সামনে ভেসে ওঠে—"India freed means humanity saved." মনে পড়ে যায় তাঁর সৌম্য শান্ত মূর্তি, তাঁর জীবনের আদর্শ। মন থেকে আপনি দুর্বলতা যায় সরে। নিজের চোখের সামনে শৃঙ্খলিতা পরপদানতা মাতৃভূমির অবস্থা দেখেছি। নেতাজীর বাণীও উপলব্ধি করেছি—"৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসীর জন্য তথা মানবজাতির জন্য দিতে হবে তোমাদের জীবন—এগিয়ে চল"—। মন থেকে সব গ্লানি যায় দূর হয়ে—তৈরী হই যুদ্ধের জন্য।

মৃতদেহের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবাসী। সামান্য কয়েক জন ইংরাজ। ২।৪ জন ইংরাজ ও ৪০।৫০ জন ভারতবাসী আত্মসমর্পণ করেছে। ইংরাজদের আমরা জাপানীদের হস্তে সমর্পণ করলাম।

ব্রিটিশভারতীয় সৈন্যদের আমরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তত্ত্বাবধানে রাখলাম। ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে আমরা ভায়ের মত ব্যবহার করতাম। যখন আমরা তাহাদের নিকট যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করতাম, তখন তারা বলত যে ইংরেজরা নিজেরা পিছনে থেকে ভারতবাসীদের হুকুম দেয় সামনে দাঁড়াবার। সাহেবরা আবার মুখে কালো রং মাখে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলে—সংকেত থাকে সুবিধার জন্য। কিন্তু আসলে ব্যাপার তা নয়। ইংরাজ সৈন্য আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে যমের মত ভয় করে। পাছে তাদের সাহেব বলে চিনতে পারে; এই জন্য কালো রং মাখে। ভারতীয় সাজতে চায়। কারণ আজাদ হিন্দ্-ফৌজ ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদের ভাই বলে মনে করত, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করত। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ইংরাজ সৈন্য ধরা। কিন্তু ২।১ জন ছাড়া আমরা বেশি ধরতে পারতাম না।

এই স্থানটি দখল করায় শত্রুপক্ষীয় বহু জিনিস আমাদের হাতে এল। এতদিন আমাদের রসদ সম্বন্ধে বড় ভয় ছিল, কিন্তু একটি বৃহৎ সরবরাহ-কেন্দ্র আমাদের অর্থাৎ আজাদ হিন্দের আয়ত্তে আসায় আমাদের ভাবনা দূর হ'ল। এ ছাড়া প্রায় ৫ শত লরীও আমাদের হাতে এল।

১৫ই মার্চ শেষ রাত্রিতে যেখানে শত্রুপক্ষীয়ের রসদ (supply) আছে সেখানে পরিদর্শনের জন্য আমাদের যেতে হোল। আমাদের লরীর চালক ছিল চাটগেঁয়ে বাঙালী মুসলমান। তাকে আমরা শত্রু-পক্ষ থেকে গ্রেপ্তার করেছিলাম। পাহাড়ী রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে। কোথায়ও শত শত ফুট গর্ত। নৈনীতাল—মুসৌরী যাবার মত পথ অনেকটা। একটু এদিক ওদিক হলেই একেবারে হাজার হাজার ফুট নীচে চলে যাব। আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না!

রাত্রি শেষ হয়ে আসচে, আকাশ অল্প অল্প ফর্সা দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ড্রাইভার মোড় না ঘুরিয়ে একেবারে সোজা চালিয়ে দিল লরী। রাস্তা ঢালু থাকায় লরী গড়িয়ে চল্ল। আমরা মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করলাম; কিন্তু এভাবে অপঘাত-মৃত্যু অদৃষ্টে ছিল না বলেই বুঝি গাড়ী সোজা যেয়ে প্রায় ৫০।৬০ হাত নীচে একটি বড় ঝাউ গাছে আটকে গেল। আমরা কয়েকজন ছিটকে পড়লাম। আশ্চর্য্য! কোন আঘাত না পেয়ে প্রাণে বেঁচে গেলাম। একজনের একটু পায়ে লেগেছিল, আর ড্রাইভারের মাথায় সামান্য চোট লেগেছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। কথায় বলে—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

১৬ই মার্চ্চ রাত্রি ১১টার সময় সেনাধিনায়কের কাছ থেকে আমরা অর্ডার পেলাম। শত্রুর শিবিরে গিয়ে সৈন্যদের ভিতর প্রচার কার্য চালাতে হবে। আসরফি মণ্ডল, শঙ্কর খাঁ, সুজন সিং, রামচন্দ্র এবং আমি এই পাঁচ জনে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার সময় বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও চারিদিক ভীষণ অন্ধকার। কাছের লোক পর্যন্ত দেখা যায় না। আমরা কম্পাসের সাহায্যে এগিয়ে চললাম। প্রায় ২।৩ মাইল দূরে শত্রুদের ঘাঁটি। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে আমরা চলেছি। কারণ শত্রুরাও হয়তো আমাদেরই মত আমাদের খোঁজে বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে শত্রুর শিবির হতে আকাশের দিকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। গা ছম্ ছম্ করছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পা টিপে টিপে আমরা চলেছি। একটু শব্দ হলেই শিকার পালিয়ে যাবে তা নয়; হয়তো আমাদের ওপর গুলিবৃষ্টি হতে আরম্ভ হবে। চলতে চলতে হঠাৎ দলের এক সঙ্গীর পা বেকায়দায় পড়ে গিয়ে গাছের ডালগুলো মট মট করে উঠল। আমার ভীষণ রাগ হলো।

এইখানে আমার বন্ধুর কাছ থেকে শোনা গল্প মনে পড়ে গেলো। আমার বন্ধু ময়ুরভঞ্জের পার্বত্য প্রদেশে হেনা পাহাড় নামে এক জায়গায় থাকতেন। জায়গাটা যেমন ম্যালেরিয়ায় ভর্তি, তেমনি প্রচুর হিংস্র বন্যজন্তুতেও পরিপূর্ণ। সেখানে ভাল ভাল টিম্বার পাওয়া যেতো সেই উদ্দেশ্যে সেখানে জঙ্গল কেটে কর্মীদের নিয়ে একটা ছোট্ট পল্লী গড়ে উঠেছিলো। দু একজন সাহেবও ছিলেন। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাঁরা ফিল্‌টার করা জল ও কুইনাইন সহ ব্রাণ্ডি খেতেন। হিংস্র বন্য জন্তুদের জন্য সব সময়ে বন্দুক রাইফেল কার্তুজ রাখতেন। টিন আর মাটি দিয়ে থাকবার জন্য অনেকগুলি ঘর তৈরী করেছিলেন। একদিন বন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে আশ পাশ বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বিকেল বেলায়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাঁরা সচকিত হয়ে চলছিলেন। তৈরী বন্দুক হাতে, আর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে যাচ্ছেন, এমন সময় পেছনে এক ভদ্রলোকের পা লেগে একটি ডাল মট মট করে ভেঙে গেলো। আর অমনি পাশ থেকে কতকগুলি হাতীর আওয়াজ শোনা গেলো। আর যায় কোথায়! বন্ধুরা প্রাণের ভয়ে ছুটতে আরম্ভ করলেন। ছুটতে আরম্ভ করে যে পর্যন্ত না নিজেদের গণ্ডীর ভিতরে এলেন ততক্ষণ তাঁরা দৌড়ান বন্ধ করেন নি। ঘরে এসে বন্ধুদের মধ্যে বচসা। যিনি ডাল ভেঙে ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে সকলেই খাপ্পা। ভদ্রলোক বলেন—দূর, আমি কি জেনে ফেলেছি, তোমাদেরই প্রাণে ভয় আছে আর আমার নেই? এই গল্প যখন আমি বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম তখন খুব উৎসাহিত হয়ে আর বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু তখন কে জানতো বিধাতা অলক্ষ্যে আমাকে লক্ষ্য ক'রে হাসছেন। কারণ সেই ঘটনা আজ আমাদের এই ঘটনার কাছে কত তুচ্ছ ছোট

এই ভেবে আমার হাসি পেলো। তখন কে জানতো যে একদিন ভারত ত্যাগ করে দেশের জন্য আমাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদান করতে হবে—আর আমাকে এই গল্পটি আমার বন্ধুদেরও বল্‌তে হবে।

কিন্তু এখন মাথা গরমের সময় নয়। খামখেয়ালীর মত কিছু কাজ করলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে। ক্রমেই এগিয়ে চলেছি, আর রাতও বাড়ছে। আমাদের দলের সঙ্গী বলে—'আর এগিয়ে কাজ নেই।' সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর ধীর গম্ভীর মূর্তি চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো, আর তাঁর উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আমার কাণে—

"বাহাদুর গ্রুপের ভাই সব, আপনাদের 'ইউনিটের' কাজ আপনাদের নামের অনুপাতেই হবে। আমাদের যুদ্ধ করতে হ'চ্ছে আমাদের ভারতবাসীর মুক্তির জন্য। তারা কাতর আহ্বানে আমাদের ডাকছে; আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আপনাদের কর্তব্য কঠোর ও বিপদসংকুল। আপনারা আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করলেই মাতৃ-ভূমির মুক্তিসংগ্রামে আমরা সফল হবো।"

তখনই মনে পেলাম অপূর্ব এক কর্ম-প্রেরণা, শরীরে এলো ভীষণ শক্তি, সাহস হলো দুর্জয়। তখনি মনে মনে সংকল্প করলাম এই ভীষণ স্থানে এই গভীর জঙ্গলে পশুর ন্যায় যদি গুলির আঘাতে প্রাণ যায় যাক্, তবুও নেতাজীর আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবো না। পা কখনও পিছনে ফেলবো না, সব সময় এগিয়ে যাবো। কারণ আমাদের দিয়েই হবে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত। নেতাজীর কাছে বিশ্বাসঘাতক হতে পারবো না। শত্রুর শিবিরের নিকট প্রায় এসেছি। হঠাৎ মনে হলো কে যেন, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে—শত্রুর সেন্‌ট্রি? না—observation post? অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না! আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে সব শুয়ে পড়ে বুকে ভর দিয়ে এগুতে লাগলাম। ভাল দেখা যায় না; আস্তে আস্তে বুকে

ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছি ; হঠাৎ ছায়াটি নড়ে উঠলো, চুপ করে আমরা শুয়ে রইলাম। নড়ে উঠা ছায়াটির কাছে আর একটি ছায়া এলো বলে মনে হলো। পরে সে ছায়াটি মিলিয়ে গেলো। বুঝলাম সেন্ট্রি বদল হ'লো। আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে এসে গেছি। এইবার আমাদের কাজ। সঙ্গীদের ডেকে বললাম—তোমরা কিছু পিছনে হটে যাও ; আমি এগিয়ে চললাম। আমার বিপদ হলে জানতে পারবে, আর সাংকেতিক আওয়াজ পেলে তৈরি হয়ে আসবে।

তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এই বিদায় হয়তো চিরবিদায়ই হবে। কারণ শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করছি। মৃত্যু নিশ্চিত। মন একটু কেঁপে উঠল, যতই হোক মানুষ তো ? কিন্তু কর্তব্য আমাকে সাহস দিলো আর ভরসাও দিলো। মনে হল নেতাজী কানে কানে বলে গেলেন—'ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।' অমনি মনের দুর্বলতা মন থেকে গেলো সরে। ভগবানকে করলাম স্মরণ। হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি। পাহারার পিছনে প্রায় তিন শত গজ ঘুরে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলাম। চক্ষু কর্ণ নাসিকাকে সজাগ করে শত্রুর গতি-বিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। তারপর সমস্ত জেনে শুনে অন্য পথ দিয়ে নিজের দলের মধ্যে এলাম ফিরে। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সে পথ দিয়ে ফিরিনি কারণ শত্রুর হাতে পড়বার ভয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছত্রটি মনে পড়ল—"যে পথ দিয়ে এসেছিলো, সে পথ দিয়ে ফিরলো না কো তারা।"

নিজের দলের মধ্যে ফিরে এসে লাউড স্পীকারের সাহায্যে শত্রুপক্ষের শিবিরে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য আরম্ভ করলাম।

লাউড স্পীকারের সাহায্যে শত্রুপক্ষের শিবিরে ব্রিটিশভারতীয়

সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালানো যে কী ভীষণ মুস্কিল এবং কত বড় বিপদ তা লিখে বা বলে বোঝান যায় না। যে কোন মুহূর্তে শত্রু ইংরাজরা আমাদের ওপর লক্ষ্য করে মেশিন গান চালাতে পারে। লাউড স্পীকারের সাহায্যে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে আমাদের আশ্রয়স্থানে এসে হানা দিতে পারে। যে কোন মুহূর্তে হতে পারে আমাদের মৃত্যু। মৃত্যু নিয়েই যেন আমাদের খেলা। প্রচার কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, তারা আমাদের ভাই, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। তারা এসেছে শুধু অর্থের জন্য। কিন্তু নিজেদের দেশকে স্বাধীন করার কাছে সে অর্থ কিছুই নয়! ব্রিটিশই আমাদের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এইগুলো আমরা স্পষ্টভাবে আমাদের শত্রুপক্ষীয় ভারতীয় সৈন্যদের বোঝাবার চেষ্টা করতাম। তারাও ভারতবাসী আমরাও ভারতবাসী। আমরা সব ভাই। আমাদের প্রধান কর্তব্য—ভারতবর্ষ শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করা। আমাদের নেতাজীর বাণীর সার মর্ম তাদের বুঝিয়ে দিতাম। এই রকম করে কত যে ভারতীয় সৈন্য আমাদের আই. এন. এ.তে যোগ দিয়েছিলো, তার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অবশ্য ব্রিটিশ সৈন্যরাও, অফিসাররাও যে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতো না তা নয়। তারাও খুব জোরের সঙ্গেই আই. এন. এ.র বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতো। ইংরাজ পক্ষে যারা এই কাজ করতো তাদের বলা হতো Victory force. দিনের পর দিন এইভাবে আমরা লাউড স্পীকারের সাহায্যে শত্রুর শিবিরের মধ্যে প্রচার কার্য চালাতাম। পূর্বেই আমাদের এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আদর্শ, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলাম।

সাধারণতঃ যখন এই রকম প্রচারকার্য করা হয়, তখন ব্রিটিশ অফিসারেরা ক্রমাগত মেসিনগান্ ও গুলি ছুঁড়তে হুকুম দেয়, যাতে করে ঐ শব্দে ভারতীয় সৈন্যেরা কিছু না বুঝতে পারে। এখন মনে হ'ল বোধহয় ব্রিটিশ অফিসারেরা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। ভাবতে না ভাবতে হঠাৎ ঝাঁকে ঝাকে গুলি আসতে আরম্ভ করল। আমরা position নিয়ে নিরাপদ জায়গায় শুয়ে রইলাম। এই গুলি চালনা দেখে মালয়ের ব্রিটিশ সরকারের গুলি চালানর কথা মনে পড়ে গেলো। মালয়ের কোটাবারু নামক স্থানে যখন জাপানীরা আক্রমণ চালায়, তখন একটি আড়ওয়াল রেজিমেণ্ট defence position এ ছিলো। কোন কিছুর শব্দ পেয়ে রেজিমেণ্টের অধিনায়ক গুলি চালাবার হুকুম দেন! সমস্ত রাত্রি ধরে চলে গুলি। এক মিনিটও বিশ্রাম নেই। সকালে দেখা গেলো দুটো মহিষ মরে পড়ে আছে, আর শত্রুরা পালিয়েছে; কোন চিহ্নই তাদের নেই। এখানেও তাই হলো। অবশ্য সেখানে মরেছিলো দুটো মহিষ, এখানে কেউ মরে নি।

ঐ রাত্রির কাজের ফলে আমাদের অনেক সুবিধে হয়েছিলো। সহজেই আমরা শত্রুকে বিতাড়িত করতে পেরেছিলাম। আমাদের অধিনায়ক ও জাপানী অধিনায়ক আমাদের সাফল্যলাভের জন্য শুভবাণী প্রেরণ করেছিলেন। এই কয়দিন আমাদের প্রায়ই অনাহারে বা অর্ধাহারে কাটছিলো। এমন সময় গেছে, যখন এক চামচ জল পর্যন্ত পেটে যায় নি। কিন্তু শত্রুর এলাকা দখল করে খাবার ও পোষাকের অভাব রইল না। তাদের সমস্ত রসদ আমাদের হাতে এসে পড়ল। আমরা পরমানন্দে আটা, ডাল, ঘি, দুধ, টিনে রক্ষিত যাবতীয় খাদ্য আহার করতে পেলাম। কারণ রণলব্ধ দ্রব্যের (Warbooty) চেয়ে আনন্দদায়ক জিনিস জয়ীর কাছে কিছুই হতে

পারে না। প্রচুর মিলিটারী পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র, লরী প্রভৃতিও আমাদের হাতে এল।

এই সময়টা ছিল বড়ই সংকটের সময়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শত্রুরা আমাদের অন্বেষণ করে বেড়াত।

১৮ মার্চ বেলা বারটার সময় শত্রুরা বোমারু প্লেনের সাহায্যে আমাদের ওপর গুলি বর্ষণ ও বোমা ফেলতে থাকে। সেই পাহাড়ী এলাকায় বম্বিংএর শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠলো। বড় বড় গাছ টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে লাগলো। সামনে, বাঁয়ে, ডাইনে, পিছনে চারিদিক থেকে বোমা আর গুলি বর্ষিত হতে লাগলো। আমরা মাটির ভিতর ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিলাম। কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারা গেল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তারা চলে গেল। আমরা তখন উঠলাম, আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেললাম।

এই সমস্ত ছাড়া যখন তখন দিনের বেলায় গুলি আচমকা আমাদের ওপর আসত। এর জন্য আমরা সর্বদা তটস্থ থাকতাম। এর ওপর আর এক বিপদ ছিল। জঙ্গলী পাহাড়ে দেশে সাপ, বিছে, জোঁক প্রভৃতি সরীসৃপ এবং নানাপ্রকার হিংস্র মারাত্মক পোকা মাকড়েরও ভয় ছিলো।

সবচেয়ে কষ্টে পড়েছিলাম আমরা জলাভাবে। জল প্রায়ই পাওয়া যেতো না, নিকটে কোন বড় জলাশয় বা সে রকম কিছু দেখতে পাওয়া যেতো না। কখন কখন পাহাড়ের গা বেয়ে ক্ষীণ ঝর্ণার ধারা বইত। তাইতেই রান্নার কাজ চালিয়ে নিতাম। জলের অভাবে স্নান করা আমাদের প্রায়ই হয়ে উঠত না। কখনো কখনো ভাল নদী যখন চোখে পড়ত—নির্মল শীতল স্বচ্ছ জল

দেখে মন খুসীতে ভ'রে উঠত, আমরা তৃপ্তির সঙ্গে স্নান সেরে নিতাম।

তা ছাড়া বৃষ্টি যখন তখনই হ'ত। বৃষ্টিতে নিজেদের বাঁচাবার কোন সরঞ্জামই আমাদের ছিলো না। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমাদের যুদ্ধ করতে হ'ত। যে পর্বতে আমাদের দিন কেটেছে, সেইরকম পাহাড় পর্বতের ধরণ ময়ূরভঞ্জের হেনা পাহাড়ে দেখা যায়। এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা বরাবর আনন্দেই ছিলাম। আমাদের আনন্দের একমাত্র কারণ ভারত স্বাধীন হবে। আর আমরা স্বাধীনতার ফল ভোগ করবো। মনে পড়ত—

"বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

এইভাবে এলাকার পর এলাকা পাহাড়ের পর পাহাড় আমরা ইংরাজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম। ক্রমেই আমাদের উৎসাহ উদ্যম বেড়ে চল্লো। টাম্মোর জয় করে আমাদের অধিনায়ক (বাহাদুর দল ও Intelligence দলের) কর্ণেল এস. এ. মালিক সর্বপ্রথম মণিপুরে আমাদের জাতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা স্থাপিত করিলেন। পরে কর্ণেল মালিক নেতাজীর নিকট থেকে যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য প্রথম পুরস্কার "সরদার-এ-জঙ্গ" উপাধিলাভ করেন। এর পূর্বে আরাকান্ ফ্রণ্টে বাহাদুর দলের আর একজন অধিনায়ক কর্ণেল এল. এস. মিশ্র এই উপাধি সর্বপ্রথম লাভ করেন।

ক্রমেই এগিয়ে চল্লাম। ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ভারতীয় বাহিনীরা

প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের পাঞ্জাবী সৈন্যগণ কর্তৃক রচিত একটি গান মনে পড়ে গেল :—

হিন্দিয়া কোমরা কসিয়ানে
আহাজী আহা বাঁধাতা
হুন হিন্দি বিচ খুসিয়া বাসিয়ানে।
পয়লা ধাক্কা লাগয়াসি
কোহিমা তোড় পৌছায়াসি।
আজ পয়লাবার দেখায়াসি,
ইংরেজী ফৌজ নাসিয়ানে।
আজ পয়লা দেখনাসি
ইংরেজী না দোর দেখনানি।
যোষ হাবসী কোমদা দেখনাসি
কিউ তোপ ছাড় ছাড় নাসিয়ানে।

গানটির সারমর্ম—

হিন্দুস্থানী কোমর কসে নাও। আজাদ হিন্দুস্থানের ভিতর খুসীর লহর বইছে। আমরা প্রথম ধাক্কায় কোহিমা ভেঙ্গে ভারতবর্ষে পৌছেচি। আজ আমরা ইংরাজদের ভারতভুমি থেকে পালাতে দেখলাম। পশ্চাদ্পসরণকারী ইংরাজ সৈন্যদের আমরা আর দ্বিতীয় বার দেখতে পাচ্ছি না। কামান বন্দুক ছেড়ে পলায়মান ইংরেজের সঙ্গে হাবসী সৈন্যের শৌর্য বীর্যের পরিচয়ও বেশ সুন্দরভাবে পেলাম।

(১৭)

কিছুদিন পরে……!

একটি খবর শুনে আমরা রীতিমত চমকিত ও বিস্মিত হয়ে উঠেছি। নেতাজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হ'য়েছিলো।

যে আগন্তুক অফিসারটির কাছ থেকে এ সংবাদ শোনা গেলো—তাঁকে প্রশ্ন ক'রলাম—'আপনি কি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী?'

'না—। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মাত্র কয়জন, যাঁরা নেতাজীর রক্ষীদলে আছেন। ঘটনাটা সত্য—কারণ রক্ষীদল, বিশ্বম্ভর দাস ও নেতাজী কেউই এ ঘটনা সম্বন্ধে দ্বিমত নন। আপনার এ সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রবার কারণ কি?'

'কোনো ভারতীয় যে নেতাজীকে হত্যা ক'রবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে পারে এ অবিশ্বাস্য সত্য বিশ্বাস ক'রতে কষ্ট হয়—?'

'পৃথিবীতে কতকগুলো মানুষ থাকে যারা কি করতে পারে, আর না পারে, তা ঈশ্বরও জানেন না!'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় নেতাজীর সত্য সত্যই কোনো শত্রু আছে?'

'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নেতাজীর পরম শত্রু .....'

'জাপানী—?'

'হ্যাঁ, জাপানী রাজনীতিও উদারনীতি নয়। আজাদ হিন্দ্ সরকার জাপানীদের তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট নয়, এটাই জাপানীদের পরম আক্রোশ। নেতাজীর মতন দৃঢ়চেতা, জাতীয়তাবাদী, অনমনীয় নেতা যে কোনো ক্রমেই আজাদ হিন্দ্ সরকারকে জাপানী সরকারের তাঁবেদার হ'তে দেবেন না—তা জাপানীরা ভালো ক'রেই জানে।...'

নীরবে আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করলাম।

আগন্তুক অফিসারটির সঙ্গে কথা বলবার জন্য যথেষ্ট লোভ হচ্ছিলো। অনেক খবর জানবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলাম—। ভাবলাম আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার অনুরোধ করলে তিনি রাজী হবেন না কি। যতদূর মনে হয় তিনি আপত্তি করবেন না;

কারণ তাঁর মধ্যে যুবোচিত আলাপ প্রত্যালাপের একটা ঔৎসুক্য প্রত্যক্ষ করেছি। সাহস ক'রে আমার মনের কথা প্রকাশ করলাম। তিনি রাজী হলেন।

অদূরে একটি ছায়াঘেরা পাথরের ওপর বসে আমরা গল্প স্থরু করলাম। আমি বল্লাম—'নেতাজীর হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যাপারটি আগাগোড়া আমাকে আর একবার বলুন—!'

'ফেব্রুয়ারী মাসের কথা'—তিনি বলতে স্থরু করলেন,—'নেতাজীকে হত্যা করবার দু বার ষড়যন্ত্র হয়।....নেতাজীর বাসভবনে পাহারা দেওয়ার জন্য রক্ষী দলের ব্যবস্থা আছে। এই দল দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দলে সশস্ত্র চারজন রক্ষী। এরা বাইরে পাহারা দেয়। অন্য দলে সশস্ত্র সাত জন। এরা ভেতোরে পাহারা দেয়। এই রক্ষী-দলের নেতৃত্ব করেন লেঃ বিশ্বম্ভর দাস। বাইরের রক্ষীদলকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলি করা হয়।....ঘটনার দিনটি ছিল অন্ধকার রাত্রি। নেতাজী তাঁর ঘরে কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। ১১টা বাজলো। বাইরের রক্ষীদল তাদের যথারীতি ডিউটি শেষ ক'রে ফিরে এলো। তাদের পরিবর্তে নূতন দল ডিউটি নিলো। বাড়ীর মধ্যেই এই রক্ষীদের ব্যারাক।...প্রথম দলের সঙ্গে লেঃ বিশ্বম্ভর দাসও ব্যারাকে ফিরে এলেন। সেখানে মৃদু আলো জ্বলছিলো। রক্ষীদলের ব্যারাকে কোনো নতুন লোক আসবে এ তিনি কল্পনাও করেন নি। যাই হোক্…সে সময় ৫০।৬০ জন সৈনিক ছিলো সেই ব্যারাকে। তিনি তাহাদের গুনলেন অর্থাৎ তাঁর যেন মনে হ'লো একজন লোক বেশি র'য়েছে। সন্দেহ হওয়ায় তিনি সকলকে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে—নিজের নিজের নাম, নম্বর প্রভৃতি ডাকতে আদেশ দিলেন। দু'জন লোক একই নাম ও নম্বর বললো।

লেঃ দাসের সন্দেহ দৃঢ় হ'লো। তিনি সেই দু'জনকে আলাদা ক'রলেন। অকস্মাৎ তাদের মধ্যে একজন রিভলবার বের ক'রে নিলো।....সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে তার কাছ থেকে রিভলবার কেড়ে নিলো। লোকটিকে বেঁধে ফেলা হ'লো—। জেগে উঠলো একটা হৈ চৈ।

'নেতাজী হৈ চৈ শুনে দোতালার বারান্দা এসে ব্যাপার কী জানতে চাইলেন। লোকটি তখন নেতাজীকে লক্ষ্য ক'রে হিন্দুস্থানী ভাষায় ব'লে উঠলো—'আপনাকে আমি হত্যা ক'রতে এসেছিলাম। ভারতের প্রতি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছেন।'...রক্ষীরা তাকে থামিয়ে দিলো। নেতাজী তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে নীচে আসতে চাইলেন—কিন্তু অফিসাররা আসতে দিলেন না।....রক্ষীরা লোকটিকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেললো।...'

'—আশ্চর্য—! এমন লোকও থাকে?' আমি স্বগতোক্তি করলাম।

'দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রটি শুনুন।..ঐ স্থানে ঐ মাসে আরও একটি ঘটনা ঘটে। সেদিনও নিবিড় অন্ধকার রাত্রি। লেঃ বিশম্ভর দাস বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন—এমন সময় একটা মোটরকার এসে দাঁড়ালো। একজন বুড়ো গোছের ভদ্রলোক সেই মোটরের পেছোনের সীটে ব'সেছিলেন।...মোটর থামতেই তিনি নেমে এলেন। তাঁকে দেখতে রাসবিহারী বসুর মতন। তিনি নেমেই নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। নাম ব'ললেন রাসবিহারী বসু! আরও বললেন—'টোকিও থেকে আসছি—খুব জরুরি দরকার। নির্জনে দেখা ক'রতে চাই।'...তাঁকে সেখানে অপেক্ষা ক'রতে বলে লেঃ দাস উপরে নেতাজীকে খবর দিতে গেলেন।...

এদিকে রক্ষীদের মধ্যে একজন রাসবিহাবী বস্থ যখন সিংগাপুরে আসেন সে সময় প্রায় এক সপ্তাহকাল তাঁর বাসায় পাহারা দিয়েছিলো। রাসবিহারী বস্থ এসেছেন শুনে সে দেখা করতে আসছিলো। তাকে দেখা মাত্র বৃদ্ধভদ্রলোকটি মোটরে উঠে পালিয়ে গেলেন।

'··এদিকে রাসবিহারী বস্থ এসেছেন শুনে নেতাজী বিস্মিত ও ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। তিনি বললেন—'রাসবিহারী বাবুর বক্তৃতা আজ সন্ধ্যায় তো টোকিও রেডিয়োতে শুনেছি। এরই মধ্যে তিনি কি ক'রে আসবেন? যাক · লোকটিকে নিয়ে এসো।'

'লেঃ দাস নীচে এসে দেখলেন লোকটি ও মোটর দুই-ই অদৃশ্য হ'য়েছে।...'

'মোটরটি ধরতে পারা গেলো না?'—আমি প্রশ্ন করলুম। 'অনেক চেষ্টা ক'রেও পারা যায় নি—।'

···আমি এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে বোবা হ'য়ে ব'সে থাকলাম।···মানুষ কতদূর শয়তান ও অকৃতজ্ঞ হ'লে তবে এ কাজ ক'রতে সাহসী হয়,—হয়তো তাই ভাবছিলুম। বাস্তবিক মানুষচরিত্র দুর্জ্ঞেয়!

'Front-এ যারা যুদ্ধ ক'রছে তাদের জন্যে নেতাজী একটি বাণী দিয়েছেন— আপনারা শোনেন নি—?'

'অস্পষ্ট ভাবে শুনেছি।'···

'আমার পকেটবুকে টোকা আছে, দেখুন না—': তিনি পকেটবুকটি আমাকে এগিয়ে দিলেন। ইংরেজিতে টোকা—

৯ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪৪ :

রণাঙ্গনে অবস্থিত সৈন্যদের প্রতি নেতাজীর বাণী।

'...সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আরাকানের রণাঙ্গনের ওপর নিবদ্ধ র'য়েছে। সেখানে আজ দূরপ্রসারী ফলপ্রসূ ঘ'টনা ঘ'টছে।' জাপানী বাহিনীর সহযোগে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গৌরবোজ্জ্বল বীরত্ব এই অংশে ইংরেজ ও আমেরিকার পাল্টা আক্রমণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আরাকান রণাঙ্গনে আমাদের সহকর্মিগণের আদর্শ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সমস্ত অফিসার ও সৈনিকদের অনুপ্রাণিত ক'রবে।

'...আমাদের বহুদিনের আকাংঙ্খিত দিল্লী অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হ'য়েছে। আরাকান পর্বতমালার উপর যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা প্রোথিত হ'য়েছে...যতোদিন না তা বড়লাটের প্রাসাদে উড়ে ততোদিন আমাদের এই যাত্রা চলবে।

' বন্ধুগণ, ভারতের মুক্তিবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকগণ! তোমাদের মনে যেন একটি বড় দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে—'হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু।' আমাদের মুখে শুধু একটি কথাই থাকবে—'দিল্লী চলো।' দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। ঐ পথেই আমাদের মার্চ ক'রতে হবে। জয় আমাদের নিশ্চিত।...'

...একটু পরে আমি বললুম—'ঝাঁসি রেজিমেণ্টের খবর কি বলুন তো?'...

ঝাঁসি রেজিমেণ্টের দুই 'কোম্পানী' নারীসেনাদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।...মেমিও হাঁসপাতালে তাঁরা একটি সেবাকেন্দ্র খুলেছেন। কালেবা সীমান্তে আহতদের এই হাঁসপাতালে প্রথম পাঠানো হ'য়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এঁরাই প্রথম আহত সৈনিক।"

'ভারতীয় নারীরা তা হ'লে সত্যিই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন ?'—আমি মৃদু হেসে প্রশ্ন করলুম।

'হ্যাঁ,—সে সম্বন্ধে দ্বিমত হবার আর দরকার দেখছি না। ঝাঁসি-বাহিনীর পক্ষ থেকে নেতাজীর কাছে যে আবেদন জানানো হ'য়েছিলো তা আপনি জানেন না—?'

'না। কি বলুন তো ?'

১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৪) লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মীর মারফৎ নেতাজীর কাছে ঝাঁসিবাহিনী এক আবেদন জানান। কথাগুলো ঠিক আমার মনে নেই তবে মোটামুটি বক্তব্যটা মনে আছে। আবেদনে তাঁরা জানান যে, তাঁদের সামরিক শিক্ষা শেষ হ'য়েছে—কিন্তু রণাঙ্গনে যাবার জন্যে কোন নির্দেশ তাঁদের প্রতি নেই। তাঁরা মাত্র সেবিকাই থেকে যাচ্ছেন।…নেতাজী ঝাঁসির রাণীর আদর্শে তাঁদের অনুপ্রাণিত ক'রেছেন। আর এও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁরা ঝাঁসির রাণীবাহিনীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হ'বেন। নেতাজী এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নারী-বাহিনীকে দেখতে পেলে শত্রু ভগ্নোদ্যম হবে, এবং বৃটিশঅধীনস্থ ভারতীয় সৈন্য আমাদের দলে আসবে।…সম্মুখ রণাঙ্গনে যাওয়ার নির্দেশ তাঁরা প্রার্থনা করেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেদের উৎসর্গ করতে এঁরা বদ্ধপরিকর ; আর তাই প্রমাণ করার জন্যে দেহের রক্তে তাঁরা এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ক'রেছেন…।'

'নিজেদের রক্তে তাঁরা আবেদন পত্র স্বাক্ষর ক'রেছিলেন ?—' আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ'—। : তিনি মৃদু হাসলেন।

আমি চুপ করে গেলুম। বিস্মিত নয়, বোধ করি চমৎকৃতও নয়—

কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতিতে মনটা ভ'রে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার শির হয়ে এলো নত।

…ভারতীয় নারীরা এমন ক'রে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা-যুদ্ধে এগিয়ে আসবে কে ভাবতে পেরেছিলো ?…যে দেশের নারী-সমাজকে চিরদিন আমরা অসহায় দুর্বল ব'লে ভেবে এসেছি—যাদের শান্ত প্রকৃতিটুকুই শুধু আমাদের কাম্য ছিলো, তাদের শক্তির রূপটাকে আজ প্রথম অনুভব করলাম। মনে পড়ে কবির সেই কথা—

'না জাগিলে সব ভারত ললনা'

এ ভারত আর জাগে না—জাগে না'—

…আজ ভারত-ললনা জেগেছে—; বিশ্বাস করি ভারতও জাগবে। আমরা সীমান্ত যুদ্ধের উত্তেজনায় মগ্ন। অন্যান্য দিকে কি হচ্ছে তার সংবাদ বড় একটা রাখবার অবসর পাই না। ··কোনো কোনো দিন ….সে অবসরটুকু আকস্মিক ভাবে আসে।

(১৮)

…কোহিমার যুদ্ধ ঘোরতর ভাবে বেধে উঠেছে। আসামের মধ্যে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা চ'লেছে।…দুর্গম পথ; পাহাড় ও ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই পথ দিয়ে সৈন্য পরিচালনা করা খুবই কঠিন। এ বিষয়ে জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য পাওয়া যাবে—এমন কথা আছে। এই 'ফ্রণ্টে' তিনটি রেজিমেণ্ট লড়াই ক'রছে।

'এ' পার্টিঃ কাপ্টেন আজমীর সিং-এর নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে এই দলটির নামকরণ হ'য়েছে।

'এম' পার্টিঃ লেফ্‌টেন্যাণ্ট মুহম্মদ হুসেনের নাম অনুসারে এই দলটির নামকরণ হ'য়েছে।

'জি' পার্টি : লেফ্‌টেন্যাণ্ট গুরুচরণ সিং-এর নামানুসারে হয়েছে। জাপানী সেনাপতি কর্ণেল ইয়ামামাতো ও জেনারেল ইসোডা আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রছেন।

কোহিমা ব্রিটিশ সৈনিকদের বড় ঘাটি। প্রায় দুই ডিভিসন সৈন্য সেখানে পথ আগলে রয়েছে।

আমাদের সৈনিকেরা এতে ভীত হ'য়ে ওঠে নি। 'হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু'···এই দৃঢ় পণ ও আদর্শ নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে।···

এপ্রিলের শেষে খবর পাওয়া গেলো আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ কোহিমা শহর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে অগ্রসর হ'য়েছে। কোহিমা শহরটি তারা দখল ক'রবেই; কারণ কোহিমার অবস্থিতি যুদ্ধনীতির দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডিমাপুর থেকে কোহিমা প্রায় ৩৫ মাইল। আবার ডিমাপুর থেকে সিলেট, ময়মনসিং, ঢাকাও খুব বেশি দূর নয়। কোহিমা হাতে এলে বাঙলা দেশে আজাদ হিন্দ্‌-ফৌজের অগ্রগতিকে কেউ রুখ্‌তে পারবে না।···

কোহিমা শহর খানিকটা আমাদের সৈন্যদের হাতে এসেছে। তারা ইংরেজ সৈন্যদের রসদ সরবরাহ প্রায় বন্ধ ক'রে দিয়েছে। খুব সম্ভবতঃ বৃটিশ বাহিনী এবার পশ্চাদপসরণ ক'রবে।

(১৯)

···কোন একটা গভর্ণমেণ্ট চালাতে হ'লে সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্ক থাকার প্রয়োজন। নেতাজী অনেকদিন থেকেই এমন একটা ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকার যে সমস্ত দেশ অধিকার ক'রবে সে সমস্ত দেশে এই ব্যাঙ্কের মারফতেই অর্থনৈতিক কাজ কর্ম হ'বে—! সম্প্রতি রেঙ্গুনে আজাদ-হিন্দ্‌-সরকারের নিজস্ব

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এ যাবৎ প্রবাসী ভারতবাসীদের দানে আমাদের গভর্ণমেণ্ট চলছিলো। এ রকম দানের কোনো স্থিরতা নেই। যার টাকা আছে সে হঠাৎ একবার বা দু'চারবার কিছু দিতে পারে। কিন্তু এ রকম টাকাওয়ালার সংখ্যা কম। তাছাড়া তাদের দানে সরকার প্রতিষ্ঠা করা ও কাজকর্ম চালানোর পরিণাম ভবিষ্যতে ভাল নাও হ'তে পারে।···আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রজা প্রবাসী ভারতবাসী। তাদের কাছ থেকে ন্যায্য ও যৎসামান্য ট্যাক্স্ নিলে আজাদ হিন্দ্ সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্ক ভালোই চ'লে।···শোনা যাচ্ছে, উপরোক্ত উপায়ে অপ্রত্যাশিত টাকা সংগৃহীত হ'য়ে ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে।

(২০)

সম্প্রতি আমার সঙ্গে জনৈক শিখ সৈনিকের আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জাতি ধর্ম নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে।··এ প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জাতি ধর্ম সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাটুকু লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চাই!

জাতি বলতে খুব স্পষ্ট কোনো কিছু আমরা বুঝি না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরই আমরা বিভিন্ন জাতি ব'লে জানি। কিন্তু আমার ধারণা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে 'জাতি' আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়। বোধ হয় 'স্বতন্ত্র একটি দেশের গণ-সমষ্টিকে' জাতি বলা অনেক অর্থবহ। জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশই এটা অন্তরে স্বীকার করেন। সমগ্র দেশের কল্যাণবোধের কামনাই তাই তাঁদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে প্রকাশ পায়।

আমরা এ দিক থেকে নিতান্ত শিশু। ধর্ম ভেদের কলহকে জাতি-ভেদের কলহে রূপান্তরিত করে নিজেদের সর্বনাশ ক'রে চ'লেছি।

বিংশ শতাব্দীতে আমাদের মতন শিশুসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে জাতি-ভেদের অজুহাতে নিজেদের অথর্ব ও পঙ্গু করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে নেই।

ধর্ম সম্বন্ধেও সেই এক কথা। ধর্ম যে কী-তা বাস্তবিক আমরা জানি না। কতকগুলো অজ্ঞান-প্রসূত সংস্কারই আমাদের ধর্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা ধর্মের নামে মনুষ্য সমাজের অন্তর দিন দিন বিষিয়ে তুলছে। ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের লোভে উচ্চ বর্ণের এই স্বৈরাচার আজ যদিও অনেকটা শিথিল হ'য়ে এসেছে....তবু তা খুব বেশি উল্লেখযোগ্য নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ব'লেছিলেন—'লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া··· ··প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতদের অত্যাচার ও অনাচার ছাটিয়া ফেল, দেখিবে এই ধর্মই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।'...কথাটা খাঁটি সত্য। কতকগুলো স্বার্থবাদী পুরোহিত শ্রেণীই সমস্ত মানুষ সমাজকে ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে যায় ও অন্ধ সংস্কারের মধ্যে জড় ক'রে রাখে।....এ কথা ব'ললাম তার যথেষ্ট কারণ দেখেছি। দেশে দেখেছি জাতিভেদটা কতো প্রবল ও বিষবহ। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের সৈনিক হ'য়ে দেখছি জাতিভেদটা কতো তুচ্ছ।···আমরা জাতি বলতে নিজেদের 'ভারতীয় এইটুকু মনে করি। 'ভারত' আমাদের জন্মভূমি · ভারতের আকাশ, বাতাস, জল ও প্রকৃতির মধ্যে আমরা লালিত পালিত····আমাদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিও মজ্জায় মজ্জায় মিশ্রিত। সেই ভারতের কল্যাণই আমাদের একমাত্র কাম্য।···হিন্দু, মুসলমান, শিখ···কোনো প্রভেদ নেই। একত্রে খাওয়া, শোওয়ার মধ্যে কোনো বাধা দেখি না। মনে হয় যেন আমরা নগণ্য খণ্ড মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে

নষ্ট ক'রে এক বিরাট সর্বগণ-মনোবৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ব'লে মেনেছি। ...এ না হ'লে ভারতের স্বাধীনতা আমাদের দুঃস্বপ্নই থাকতো।

ভারতকে স্বাধীন করতে হ'লে ঠিক এমনটিই চাই। পরস্পরকে ভাই ব'লে এক সঙ্গে ..কদমে কদম মিলিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি... কণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হ'চ্ছে—'হিন্দি হায় হাম, হিন্দুস্থান হামারা...'

...তা ব'লে কি ভাবতে হ'বে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্মকে আমরা অস্বীকার ক'রেছি? না তা নয়! সম্প্রদায়গত ধর্মের ওপর কোনো বাধা নিষেধ নেই। কেউ কারুর ধর্মকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করে না। প্রত্যেকে নিজের ধর্মে নিজের মনোমত উপাসনা ও পূজাপাঠের স্বাধীনতা পেয়েছে।

...শুধু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মধ্যে নয়....এই মনোবৃত্তি আজাদ হিন্দ্ সরকার শাসিত সমস্ত প্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যেই সঞ্চারিত হ'য়েছিলো।

কে এই মহাপুরুষ যাঁর জন্যে এই মহামিলন সম্ভব হ'লো? একজন সহকর্মী এ প্রশ্নের উত্তরে ব'লেছিলেন—'এ সমস্ত গৌরব একমাত্র নেতাজীর। তাঁর ভিতরে আমরা দেখেছি চৈতন্যের প্রেম, বুদ্ধের সাম্য, খৃষ্টের সহ্য ও ক্ষমা, নেপোলিয়ানের শৌর্য ও নেতৃত্ব।'

(২১)

এগিয়ে চলেছি স্রোতের বেগে ইম্ফলের দিকে—ইম্ফল দখল করতে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তীব্র আক্রমণকে ব্যহত করতে গর্জে উঠলো—তাদেরই আক্রমণে বিব্রত ইংরেজ সৈনিকের কামান। বর্তমান সভ্যজগতে আধুনিক সভ্যজাতি বলে পরিচয় দিতে যত রকম যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন কোনটারই অভাব নেই তাদের। তাই নিয়ে

তারা রুখে দাঁড়াল—নেতাজীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুষ্টিমেয় সৈনিকের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে ইম্ফলকে বাঁচাতে। ...

মুহূর্মুহু গর্জে উঠছে শত্রুপক্ষের কামান। গতিপথে বাধা দিচ্ছে ট্যাঙ্ক! শহিদের বক্ষপঞ্জর বিদ্ধ ক'রছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর অর্থপুষ্ট দেশী ও বিদেশী নরঘাতকের মেসিনগান, লুইস গান, টমি গানের বুলেট্। ঘন বনানীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কেঁপে উঠছে কামানের বজ্রনিনাদে। ইম্ফলের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে ধোঁয়ায়। চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চলেছে আমাদের ওপর। স্থলপথ ও আকাশপথ উভয় পথের আক্রমণের মধ্যেই এগিয়ে চলেছি আমরা। উভয়পক্ষের শত শত লোক বরণ করছে মৃত্যুকে। কারুর দিকে কারো তাকাবার সময় নেই মুহুর্তমাত্র। এক মুহূর্ত গেলে বুঝি সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

তুমুল আক্রমণের মধ্যেই আমরা এগিয়ে চ'ললাম। অবশেষে ২৫শে মার্চ, আমরা—বাহাদুর দল ও ইন্‌টেলিজেন্স দল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল আক্রমণ করলাম। অন্যদিক দিয়ে মেজর আজমীর সিং ও মেজর মগর সিং-এর অধিনায়কত্বে বাহাদুর দলেরই আর একটা অংশ কোহিমা দখল করে ইম্ফল-ডিমাপুর রাস্তা দখল করে বসল। তাদের ঘাঁটি থেকে ডিমাপুর আর মাত্র ৩৫।৩৬ মাইল দূরে। তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, ইম্ফল পতনের আশায়। অন্যদিকে আমরা বিশানপুর পৌঁছে মণিপুর-শিলচর রাস্তা দখল করে নিলাম। মাতৃভূমির বন্ধন মোচনের জন্য সন্তানের রক্তদান বোধ হয় সার্থক হল! এইবার বোধ হয় আমরা শৃঙ্খলিতা মাতার বন্ধন মুক্ত করে তাঁর আকাশে স্বাধীন জাতির জাতীয় পতাকা তুলে ধরে বলতে পারব—'আমরা স্বাধীন!'

ইম্ফল এখন আমাদের আয়ত্তের মধ্যে।

ইম্ফলকে ঘিরে শত্রুপক্ষের চতুর্দিকে আমরা দৃঢ় ব্যূহ রচনা করে বসে আছি। শত্রুপক্ষের বড় বড় কর্তারা এতক্ষণে বোধকরি তাঁদের মাথার চুল ছিঁড়ছেন।

এমন সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রথম ডিভিসনের অধিনায়ক কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) এম. জেড. কিয়ানী তাঁর ডিভিসনের গান্ধী ও আজাদ ব্রীগেড্ নিয়ে ইম্ফল এলাকায় প্রবেশ করলেন। কর্ণেল এনায়েৎ কিয়ানীর অধিনায়কত্বে গান্ধী ব্রিগেড প্যালেল হ'য়ে, আর আজাদ ব্রিগেড্ কঃ গুলজারা সিং-এর অধিনায়কত্বে ইম্ফলের সীতাপাহাড়ী ডিঙ্গিয়ে শত্রুর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ; তাদের বিব্রত করে তুললো তীব্র আক্রমণে। আমাদের এক ডিভিসনেরও কিছু কম সৈন্য সামান্য জাপানী সৈন্যের সহায়তায় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে শত্রুপক্ষের ছয় ডিভিসন অর্থাৎ প্রায় সওয়ালক্ষের মত সৈন্যকে ঘিরে রাখল, তাদের ব্যূহভেদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে।

সম্মুখ যুদ্ধ সুরু হলো। গোলা গুলি দিয়ে চলতে লাগল উত্তর আদান প্রদান। কেউ কম যায় না। যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ হতে ভীষণতর, এবং ভীষণতর থেকে ভীষণতমে দাঁড়ালো। কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল আমাদের সামনে। চতুর্দিক থেকে যেন অগ্নি বর্ষণ হতে লাগলো আমাদের ওপর। মেসিন গানের বুলেট বাধা দিতে লাগলো আমাদের গতিপথ। কিন্তু কার সাধ্য এই উদ্দাম গতিরোধ করে? গঙ্গার গতিবেগে পৃথিবী ধ্বংস হবে ব'লে মহাদেব, পৃথিবীকে রক্ষা করতে একবার, নিজের মাথা পেতে দিয়েছিলেন গঙ্গাকে ধারণ করতে —কিন্তু আজ? আজ যে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি। পৃথিবীকে ধ্বংস করতে বসেছে এক দাম্ভিক জাতি ক্ষমতার উচ্চ শিখরে বসে।

অত্যাচারে, অপমানে, শোষণে ক্লিষ্ট করে তুলেছে মানবাত্মাকে। আজ সেই অত্যাচারিত অসম্মানিত বিরাট সমষ্টির একটা ক্ষুদ্র অংশ শোনাতে এসেছে মুক্তির বাণী। নিশ্চিহ্ন করে দেবে তারা এই পৃথিবীর বুক থেকে অত্যাচারের শেষ খেলা!

ইংরেজ মরিয়া হয়ে তীব্র ভাবে বাধা দিতে থাকে। কিন্তু সাধ্য কি তাদের? স্বাধীনতাকামীর শৌর্য বীর্যের কাছে চির অত্যাচারী শোষক ইংরাজের জনবল ও বিরাট যুদ্ধসম্ভার অতি নগণ্য। নাই বা থাকলো জনবল, অর্থবল। আমাদের অন্তরে আছে দেশজননীকে স্বাধীন করবার দৃঢ় সঙ্কল্প—বিশ্ববাসীকে অত্যাচার ও শোষণ থেকে বাঁচাবার চরম আকাঙ্ক্ষা। তাই বোধ হয় আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লো না।

(২২)

একদিন প্যালেল এলাকায় গান্ধী ব্রিগেডের কয়েকজন অফিসার একদল গুর্খা সৈন্যের সংস্পর্শে এলেন। উক্ত অফিসাররা তাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। গুর্খারা উক্ত অফিসারদের ডাক দিলো আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে ভালো ভাবে সব কিছু শুনবে ও জানবে বলে। অফিসার কয়টি সরল বিশ্বাসে তাদের কাছে গেলেন সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন বলে। নিজের ভালো মন্দ বিষয়ে অন্ধ গুর্খা—যোদ্ধার জাতি গুর্খা—বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমণ করলে আমাদের অফিসারদের, তাদের বিদেশী প্রভুর আদেশে। কোথায় নেমেছি আমরা। যে জাত একদিন নিজের কথা রাখবার জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করতো না, আজ তারই বংশধর বিনা দ্বিধায় নিজের ভাইয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে একটি

বিদেশী প্রভুর কথায়! একজন শিখ অফিসার মৃত্যু উপেক্ষা ক'রে "ম্যায় তুমহারা খুন পিউঙ্গা" বলে ইংরেজী অফিসারটির ওপর উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমূল বিঁধিয়ে দিলেন ধারাল কৃপানটি তার বক্ষে। তিনিও রেহাই পেলেন না বর্বর গুর্খাদের আক্রমণের হাত থেকে। তখনই বরণ করলেন মৃত্যুকে।

শত্রুপক্ষের স্থলপথে সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো—রসদে পড়লো টান। তাদের পক্ষে পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠলো। এ অবস্থাটা আমাদের কাছে হয়ে উঠলো বেশ উপভোগ্য। অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্যে পেছন থেকে বিমানযোগে প্যারাস্থটের সাহায্যে শত্রুপক্ষ তাদের সরবরাহের কাজ চালাতে লাগলেন। শুধু খাবার জিনিসই নয়—গোলা-গুলি, জিপ-লরী, খচ্চর-ঘোড়া প্রভৃতি সব কিছুই এইভাবে সরবরাহ হতে লাগলো। এই ভাবে সরবরাহ করায় আমাদেরও যে লাভ কিছু না হচ্ছিল তা নয়। আমাদেরও ভাগ্যে তাদের ভাগের কিছু কিছু মধ্যে মধ্যে জুট্‌ছিলো। ওরা যখন উপর থেকে জিনিস ফেলে, অনেক সময়ে তা আমাদের এলাকায় এসে পড়ে। আমাদের এলাকাকে ওরা ভয় করে! কাজেই এগোয় না।

এ সময় আর একটা বিপদ ঘটতে লাগলো। শত্রুপক্ষ যা ফেলে যেতো আমরা তা গ্রহণ করতাম নির্বিবাদে। সম্প্রতি বিপদ দেখা দিলো। শত্রু জিনিস ফেলে যায় ইচ্ছে করে, আর সেই জিনিসের মধ্যে থাকে মারাত্মক বিস্ফোরক। হাত দিলেই ফেটে ওঠে। আমাদের লোকজন আহত হতে লাগলো। বুঝতে পারলুম পরিত্যক্ত জিনিসের মধ্যে 'বুবি-ট্রাপ', 'মাউচ-ট্রাপ', 'সার্পনাল মাইন', 'কাটিং চার্জ' ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরক রেখে যায়।

আমরা এগুলো জেনে যাবার পর আর শত্রু পরিত্যক্ত জিনিস নির্বিবাদে নিতুম না।

...এইভাবে যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠতে লাগলো।

...ভীষণভাবে বৃষ্টি নামলো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও উঠলো বেড়ে।

আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে শত্রুপক্ষকে পিছু হঠাবোই, আর ওরাও প্রাণপণ ক'রে আমাদের দিচ্ছে বাধা।

এ সময়ে আমাদের মধ্যে কেমন একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো—রোজ সকালে টস্ করতাম; মানে সে দিনের যুদ্ধে জিতবো, না হারবো, তার ভাগ্য গণনা।

দিনের পর দিন কাটতে লাগলো—হাতের মুঠোর মধ্যে জীবন নিয়ে হাজার বিপদের মধ্যে ধৈর্য ও সাহস নিয়ে দৃঢ়ভাবে আমরা আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

(২৩)

২০শে মে, ১৯৪৪...

বিশে মে তারিখে কম্যাণ্ডার থেকে হুকুম হ'লো পাঁচজন লোককে শত্রুব্যূহের মধ্যে গিয়ে খবর আনতে হবে। কে কে যাবে?...**আমি সর্বপ্রথম নিজেকে স্বেচ্ছায় এ কাজের জন্যে বিলিয়ে দিলাম।** আরো চারজন যোগাড় হ'য়ে গেলো।...

ভোরে কিছু খাবার অর্থাৎ টিনের দুধ, টিনের তরকারী, কিছু রুটি ইত্যাদি খাদ্য সঙ্গে করে নিলাম।....আর সঙ্গে থাকলো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস, হাতিয়ার ও গুলি।

...সারাদিন পার্বত্যভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে সন্ধ্যে বেলায় গন্তব্য

স্থানে এসে পৌঁছোলাম।···সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছিলো; কোনো রকমে একটু উদর পূরণ ক'রে ভবিষ্যত অগ্রগতির কথা ভাবছি...এমন সময় শত্রুপক্ষের মোর্টারের গুলি এসে পড়তে লাগলো আমাদের চারি পাশে।···বড়ই বিব্রত হ'য়ে উঠলাম। বোধ হয় তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে ছোট পাহাড়ের আড়ালে গোটা কয়েক বড় বড় পাথর ছড়ানো আছে। একটু ঝোপ, মতনও চোখে পড়লো।··· দেখলাম ওটাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।···গুলি বর্ষণ একটু কমতেই হামাগুড়ি দিয়ে কোনো রকমে সেই পথটুকু অতিক্রম ক'রে পাথর-গুলোর কাছে এসে পৌঁছোলাম।...জায়গাটা আশ্রয় নেবার পক্ষে লোভনীয়।··তার আড়ালে আমরা শুয়ে পড়লাম।

···সারা রাত গোলা-গুলির মধ্যে সচেতন ভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খানিক পরে ধড়-মড় ক'রে উঠে বসলাম।

···একটু মাত্র আলোর আভাষ জেগেছে....অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। যাত্রার শুভক্ষণ!···যাবার জন্যে তৈরী হ'তে লাগলাম। তখন দেখি বড় কেউ একটা এগুতে রাজী নয়। অসহ্য রাগ হ'লো; কিন্তু সে সময় কোনো কিছু বলা—অনেক রকমেই বিপজ্জনক, তাই কিছু ব'ললাম না। মুক্তেয়ার সিং নামে একজন পাঞ্জাবী আর আমি আশ্রয় ছেড়ে শত্রুর মজবুত ডিফেন্সের সীমানায় পা বাড়ালাম।

খানিকটা সমতল ভূমি অতিক্রম করার পর ঘন তৃণগুল্ম লতা আচ্ছাদিত অঞ্চলের মধ্যে এসে পড়লাম। বড় কাছাকাছি এসে পড়েছি; এমনি ভাবে যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক। হাঁটুগেড়ে ব'সে পকেট থেকে ছুরি বের ক'রে যতো পারলাম বুনো লতা-পাতা কেটে নিলাম। 'ক্যামোফ্লেজের' দরকার। সেই লতা-পাতা গায়ে জড়িয়ে

'ক্যামোফ্লেজ্' হওয়া গেলো। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম।

....ভোর হ'য়ে এলো। দূরের শ্লোক চোখে পড়ছে।....বোধ হয় শ'খানেক গজ দূরে ডানদিকে পাহাড়টা যেখানে উঁচু হ'য়ে উঠেছে সেখানে একজন সেন্‌ট্রি বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁদিকে প্রায় শ' দেড়েক গজ দূরে দু নালার মধ্যে কাশ ঝাড়ের পাশে আর একজন। শ' কয়েক গজ দূরে একটা 'মেসিনগান পোষ্ট··· ।'

না, এগুনো চলে না।

অপেক্ষা করতে লাগলাম সুযোগের জন্যে।

ঘণ্টা খানেক কেটে গেলো।....

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সেন্‌ট্রিদের মধ্যে বুঝি একটু অলসতা এলো। সারা রাত্রির পরিশ্রমের পর শিথিলতা।....

...উপায় নেই আমাদের যেতেই হবে। ফিস্ ফিস্ ক'রে মুক্তেয়ার সিংকে বললাম—'সিংজি, মনে মনে একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে নাও।'

'তার চেয়ে স্মরণ করে নেওয়া যাক জন্মভূমিকে—আর নেতাজীকে ·· কি বলো?' সিং বললে।

মাথা নাড়লাম। · তারপর আমরা দুজনে দুজনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলাম; কেননা, মরবার মুহূর্তে পাশাপাশি থাকা হয় তো সম্ভব হয়ে উঠবে না।

ডিফেন্স্ লাইনের মধ্যে ঢুকছি। তীক্ষ্ণ চোখ, সমস্ত শরীর দৃঢ়; বুকে হেঁটে একটু একটু ক'রে এগুচ্ছি। যদি একটু শব্দ হয় বা শত্রুপক্ষ সন্দেহ করে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক, মেসিন গান, ব্রেন গান···গর্জে উঠবে।

বোধ হয় তিরিশ-চল্লিশ গজ হবে। অনেক কষ্টে শত্রুব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।···যাক্ শত্রুপক্ষ আমাদের দেখতে পায়নি।

··ঝোপের আড়াল থেকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য কর্তে লাগলাম ওদের অবস্থান···।

বেশির ভাগই ভারতীয় সৈন্য, কিছু ইংরেজ, আর কিছু হাব্‌সী।···

এটা একটা বড় রকমের সাপ্লাই। এখান থেকে সৈনিকদের রসদ, গোলাগুলি ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

····যথাসম্ভব শীঘ্র কাজ শেষ ক'রে ফিরতে হবে। ভোর থাকতে থাকতে ফিরবো ভেবেছিলাম—তা আর হ'লো না—একটু দেরী হ'য়ে গেলো।

···আমরা ফিরছি। যে পথ দিয়ে এগিয়েছিলাম সে পথে নয়, অন্য পথ দিয়ে। আমার সঙ্গীটিও অন্যদিক দিয়ে চলেছে।···

খানিকটা এগিয়ে এসেছি হঠাৎ বাঁ দিকের কাশের ঝাড় থেকে গম্ভীর অথচো চাপা স্বরে আওয়াজ এলো—

'হল্ট্, কোন হ্যায়—?'

'দোস্ত!' : উত্তর দিলাম। সমস্ত বুক কেঁপে উঠলো।

'পাশ-ওয়ার্ড—?

ওদের পাশ-ওয়ার্ড আমার জানা ছিলো না। আমার সঙ্গীটি তখন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে। কি করি! অগত্যা বললুম: 'ম্যায় তোমরা প্লাটুন কম্যাণ্ডার হুঁ···!'

অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং দৃঢ়ভাবে জবাব এলো—

'নেহি, পাশ-ওয়ার্ড ক্যা হ্যায়?'

···বুঝলাম চালাকি টিকলো না। পালাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পারলুম না; আমাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ সুরু হল।

মাটিতে শুয়ে পড়ে দু'চার কথায় আমাদের অর্থাৎ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উদ্দেশ্যের কথা বোঝাবার জন্যে চীৎকার করতে লাগলুম।

…কোনো কৌশলই খাটলো না। ওপক্ষ দলে ভারী ব'লেই মনে হ'লো। বুঝলাম ওরা ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে।

.. তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে বের ক'রলাম হাত বোমা। একটু সুযোগ বুঝেই ছুঁড়ে দিলাম। একটা—দুটো…! ওপক্ষের আর্তনাদ কানে এলো…। ঘায়েল হ'য়েছে!…মাথা উঁচু ক'রে দেখলাম ১৫।২০ হাত দূরে তিনজন লোক জখম হ'য়েছে। তার মধ্যে দুজনে ইংরেজ। ছুঁড়লাম আর একটা হাত বোমা। সঙ্গে সঙ্গে টমি গান।…

…উঠে দৌড় দিয়েছি, কিন্তু সামনে একজন ইংরেজ আর গোটা কয়েক সৈনিক।…ওরা আমায় ঘিরে ফেলেছে! মাথার মধ্যে কি হ'লো? কী ঘটছে তা জানি না। আর এক ঝাঁক গুলি চালালাম।

…তারপর কী হ'লো জানি না—কে জখম হলো তাও বুঝি নি। খানিকটা ধোঁয়া…আর্তনাদ…আমার সামনে একটু ফাঁকা রাস্তা ।

…প্রাণ নিয়ে ফিরে এলাম দলে।

…শুনি আমার সঙ্গীটি এসে খবর দিয়েছে—'বোস, শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়েছে—অথবা মারা গেছে।' আমরা আর অপেক্ষা না ক'রে আড্ডায় এসে মিশলাম। আমার সিনিয়র অফিসার আমাকে তো খুব এক চোট্ বাহবা দিলেন; জাপানী অফিসারটিও। পুরস্কারস্বরূপ নেতাজীর কাছ থেকে **'সনদ-এ-বাহাদুরী'** উপাধি পেলাম।

(২৪)

২৫ মে—১৯৪৪

…২৫ মে সকালে কোনো কাজ ছিলো না। আগের দিন রাত্রের ক্লান্তিটুকু দূর করবার জন্যে একটু শুয়ে আছি। বেলা প্রায় বারোটা আন্দাজ হবে হঠাৎ বোমারু বিমানের গুঞ্জন এলো ভেসে।…পাহাড়ী

এলাকা সময় অসময় নেই. ঝাঁক বেঁধে প্লেন্ আসে, বোমা ফেলে নির্বিবাদে আবার ফিরে যায়। আমরা তো রীতিমত অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি এমন ধরণের আক্রমণে। গা সওয়া হয়ে গিয়েছে...!

...তাই সে দিনও যখন ঝাঁক বেঁধে প্লেন্‌গুলো এলো...আমরা সামান্য মাত্র বিচলিত না হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম তারা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।

মাথার ওপর প্লেন্‌গুলো ঘুরে বেড়াতে লাগলো—ঈগলের মতন।...

বুম...বুম...আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বোমা পড়লো। হাই এক্সপ্লোসিভ্ ফেলতে সুরু করেছে। পাহাড়ের কঠিন মাটিও ফেটে চৌচির হ'য়ে গেলো। আগ্নেয়গিরির ধ্বংসশক্তি জীবনে কখনো উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটেনি—তবু মনে হ'লো এ যেনো অনেকটা তাই—পাথর টুকরো টুকরো হ'য়ে বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চার পাশে।...

বুম্...বুম্...ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই...একের পর এক প'ড়েই চলেছে। বোমাগুলো ক্রমেই কাছে পড়তে লাগলো। ওরা কি আমাদের চারপাশে ঘিরে মেরে ফেলতে চায়?

আমরা শুয়ে পড়লাম মাটিতে।...সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বোমা। ভীম সিংএর গলা স্প্লিন্‌টারের (Splinter) আঘাতে দু' টুকরো হ'য়ে গেলো। আঁৎকে উঠলাম আমরা। তার দেহের দু'ভাগ দু'দিকে ছিটকে পড়লো।...সহীদের উত্তপ্ত রক্ত ইম্ফলের মাটি ভিজিয়ে যেন তার শেষ শপথ পূর্ণ ক'রলো।

একের পর এক আহত হ'তে লাগলো আমাদের সংগীরা। সংগর খাঁর উরুর মাংস কেটে স্প্লিন্‌টার ঢুকে গেলো। ২য় লেফট্‌নাণ্ট আসরফি মণ্ডলের দেহটা মাংসপিণ্ডের মত ছিটকে পড়লো তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে!...

…তারপর…তারপর খেয়াল নেই। কী যে হ'য়ে গেলো—। অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব ক'রলাম পায়ে।… মনে হ'লো বুঝি একশ'টা দা দিয়ে কেউ কোপ মারলো। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হ'লো দেখি ক্যাম্পের এক জায়গায় শুয়ে র'য়েছি। আমার পায়ের হাড় ভেঙে টুকরো হ'য়ে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসায় আর কত যন্ত্রণা কমে?

সময় কাটতে লাগলো। কী অসহ্য যন্ত্রণা। সমস্ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত কুঁকড়ে যাচ্ছে। কি হ'লো, আমি কি আর বাঁচবো? শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে, দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে লক্ষ সূচীবিদ্ধবৎ ব্যথা। ক্রমেই সংজ্ঞা যেন হারিয়ে ফেলতে লাগলাম।

মনে পড়ছে দেশ মনে প'ড়ছে বাড়ী, আর আত্মীয়স্বজনের কথা,—মনে প'ড়ছে যুদ্ধ জীবনের ইতিহাসটুকু। কোথায় ছিলাম—কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেলো! কোথায় সেই বাঙলা, আর কোথায় আমি! ইম্ফলের রণাংগণে আহত হ'য়েছি ক্ষতি নেই, যদি ম'রে যাই তাই বা কি? তবু কোথায় একটা ব্যথা পাক দিয়ে উঠছে। বিরাট কী যেনো একটা প্রত্যাশা—স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে গেলো! কী যে প্রত্যাশা, কী যে আকাঙ্ক্ষা! ভাবতে চেষ্টা করি। অকস্মাৎ যেন মনে হ'লো, অন্তর দিয়ে আমি কামনা করছি তুচ্ছতম একটা জিনিস। সে হ'চ্ছে স্মৃতি। আমি কায়মনে চাইছি দেশবাসী যেন আমায় একটু মনে রাখে! আশ্চর্য, কেনই বা এ আশা? কত শত শত সৈনিক আমার মতন ইম্ফল রণাংগণে প্রাণ দিয়েছে, কে মনে রেখেছে তাদের কথা!

হায় মানুষের মন!

(২৫)

রাত্রি হ'য়ে এলো। যুদ্ধছন্দের মধ্যে যতি নেমেছে। হয়তো একটু পরেই আবার ঘুরে হিংস্রতা মুখর হ'য়ে উঠবে।

আমি শুয়ে র'য়েছি; একটা ফাঁক দিয়ে আকাশের তারা চোখে প'ড়ছে।...এমন সময় এলো ডাক্তার। অনেকক্ষণ পরীক্ষা ক'রলো। ইচ্ছে হ'লো আমি তাকে প্রশ্ন করি—'আমি কি বাঁচবো?' হয়তো প্রশ্নও কোরতাম। হঠাৎ ডাক্তারটি ব'লে উঠলেন—'আপনি সৈনিক, অত অধৈর্য হওয়া আপনার উচিত নয়; moreover though it is a major wound yet I think a better hospital can make you all right within some months !'

'ধন্যবাদ !'—ডাক্তার বিদায় নিলো।

বিহারী অফিসার বন্ধুটি কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

'বোস্—ভয় পেয়ো না, তুমি শীঘ্র ভালো হ'য়ে যাবে।'

'হয়তো তাই হ'বো। কিন্তু আপনি জানেন না, একদম মরে যাওয়ার চেয়ে পঙ্গুর মত শুয়ে থাকা কী বিরক্তিকর। যেখানে আপনারা সকলে যুদ্ধ ক'রে একটু একটু ক'রে অগ্রসর হবেন ভারতের দিকে, আমি তখন হাসপাতালে শুয়ে অলস যন্ত্রণাময় দিন কাটাবো।'

'না না বোস, তুমিও আমাদের সংগী হ'বে, Why do you worry !'

মনকে সংযত ক'রলাম। অফিসারটিকে বললাম—'নেতাজীর 'ফাষ্ট অর্ডার অব্ দি ডে' আমাকে একবার শোনান তো ?'

তিনি বলতে লাগলেন—

"দূরে, বহু দূরে, নদ নদী ছাড়াইয়া, অরণ্য পর্বত ছাড়াইয়া ঐ আমাদের মাতৃভূমি। ঐ দেশে আমরা জন্মিয়াছি। ঐ দেশে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। ঐ শোন ভারত আমাদের ডাকিতেছে। ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে। আটত্রিশ কোটি দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাকিতেছে।

"ওঠ! নষ্ট করিবার মত সময় আর নাই। অস্ত্র হাতে নাও। দেখ, তোমার সম্মুখে স্বাধীনতার পথ রহিয়াছে—যে পথ আমাদের পূর্বগামীরা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রু-সেনার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি চাহেন আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিব। যে পথ দিয়া আমাদের সেনা বাহিনী দিল্লীতে পৌঁছিবে—শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব।

"দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ! চ'লো দিল্লী।"

রাত্রি গভীর হ'য়ে আসতে লাগলো। আকাশের তারাগুলো জ্বল জ্বল ক'রছে দীপ্ত চোখের মতন। অকস্মাৎ আমার মনে হলো ওই তারাগুলো যেন হাতছানি দিচ্ছে।…মৃত্যুর নয়, জন্মের—জয়ের। ওরা যেন আকাশের তারা নয়, ওরা চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর উন্মুখ আশার হাতছানি। আমার পরাধীন ভাই বোনের আকুলিত আহ্বান, আমার মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ স্বপ্নঘন হৃদ্‌পিণ্ড! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, কোটি কণ্ঠ যেন বোবার নিস্তব্ধতায় ওষ্ঠ কম্পিত ক'রে ডাকছে।

আমি বাঁচবো—আমি যাবো, রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে এনে দেবো তোমার স্বাধীনতা। আমার ভাববিহ্বল কণ্ঠে উচ্চারিত হলো: জয় হিন্দ্।